যাকাত
সাওম
ই'তেকাফ

আবদুস শহীদ নাসিম

যাকাত সাওম ই'তেকাফ

যাকাত
সাওম
ই'তেকাফ

আবদুস শহীদ নাসিম

যাকাত সাওম ই'তেকাফ

আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 978-984-645-055-2
শ. প্র : ০২

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন- ৮৩১১২৯২

প্রকাশকাল
প্রথম মুদ্রণ : মে ১৯৮৭
চতুর্থ মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৯

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য : ৩২.০০ টাকা মাত্র

Jakat Saum E'tequf By Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Bangladesh. Phone : 8311292. First Edition : May 1987, 4rt Print : August 2009. Right : Author.
Price Tk. 32.00 Only

ভূমিকা

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

'যাকাত সাওম ই'তিকাফ' শীর্ষক পুস্তকাটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হয় ১৯৮৭ সালে। বছর পাঁচেক পূর্বেই বইটি ফুরিয়ে গেছে। এখন প্রকাশ হচ্ছে দ্বিতীয় সংস্করণ। এ সংস্করণ প্রকাশ হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বর্ধিত কলেবরে।

আশা করি, এখন পুস্তিকাটি পাঠকগণের অধিক উপকারে আসবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এ পুস্তিকাটি দ্বারা আমাকে এবং পাঠকবর্গকে উপকৃত করুন, আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম

সূচিপত্র

যাকাত

যাকাত

১. যাকাত

যাকাত কেবল ইসলামী অর্থ ব্যবস্থারই একটি মৌলিক স্তম্ভ নয়, যাকাত ইসলামী জীবন ব্যবস্থারই অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ। যাকাত ইসলামের অন্যতম প্রধান বাধ্যতামূলক ইবাদত। ঈমানের পর সালাত আর সালাতের পরই যাকাতের স্থান। সালাতের গুরুত্ব ও বিধিবিধান জানা না থাকলে যেমন সঠিকভাবে সালাত আদায় করা যায় না; ঠিক তেমনি যাকাতের শরয়ী গুরুত্ব ও বিধিবিধান জানা না থাকলে এ গুরুত্বপূর্ণ ইবদাতটিও সঠিকভাবে পালন করা যায়না।

ইসলামী শরীয়তে যাকাত প্রদান না করা একদিকে যেমন চরম অপরাধ, ঠিক তেমনি যাকাত অর্থশালীদের সম্পদে অভাবীদের অধিকার হবার কারণে যাকাত পরিশোধ না করলে সমাজের একটি বিরাট অংশ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।

যাকাত ব্যবস্থা ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যাকাত সবচাইতে কার্যকর ব্যবস্থা। যাকাত সামগ্রিকভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থেকে অন্যায় আবিলতা দূর করে সমাজকে সুষ্ঠ, সুন্দর, বিকশিত ও সুসংহত করে তোলে। যাকাত এনে দেয় নৈতিক পরিশুদ্ধি আর যোগান দেয় সামাজিক পুষ্টি।

বর্তমান বিশ্বের, বিশেষ করে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আর এ উদ্দেশ্যে যাকাতের উপর ব্যাপক আলোচনা গবেষণা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আজকের এ নিবন্ধে আমরা যাকাত সম্পর্কে একটি হ্রস্ব আলোচনারই সুযোগ পাবো। দীর্ঘকথা বলার সুযোগ এখানে নেই।

শুরুতে একটি কথা বলে নেয়া জরুরী। তাহলো, শরীয়তে যাকাতের ফরযিয়ত সম্পর্কে কোনো প্রকার মতভেদ নেই। নেই কোনো প্রকার অস্পষ্টতা।

কিন্তু আমরা যখনই যাকাতের বিধান আলোচনা করতে যাই, তখন আমাদের সম্মুখীন হতে হয় কতগুলো অনিবার্য সমস্যার। কারণ, যাকাতের উপর যা কিছু লেখা হয়েছে, তা হয়েছে মূলত বহুকাল আগে, ইসলামের প্রাথমিক কয়েক শতাব্দীতে।

কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সেকালের তুলনায় একালের ব্যবধান দুস্তর। সোনা-রূপার মূল্যমানে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। পরিমাপ ও ওজনের ধরণ পাল্টে গেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র ও ধরণ ধারণে এতোটা পরিবর্তন এসেছে, যা সেকালে কল্পনাই করা যায়নি। ফলে, এ কালের কি কি সম্পদে যাকাত ধার্য হবে, আর কিসে কিসে হবে না, তা নির্ধারণ করা জটিল হয়ে পড়েছে এবং ফকীহদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মতভেদ। তাছাড়া একালের ওজন ও মূল্যমান নির্ণয় করার ক্ষেত্রেও কিছু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এসব সমস্যা সমাধানের অযোগ্য নয়। প্রয়োজন শুধু একদল লোককে এগিয়ে আসার, গবেষণা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার এবং ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচান করবার। কিন্তু একালে এ কাজটিই হয়েছে খুব কম। শাইখ মাহমুদ সালতুত, ইউসুফ আলকারদাভী এবং সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী একালের প্রেক্ষিতে যাকাতের উপর অনেক আলোচনা করেছেন। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। তাই যাকাতের বিধানের ক্ষেত্রে প্রচুর বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা ও গবেষণা হওয়া দরকার। মৌলি নির্দেশনা কুরআন, হাদীস এবং ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে তো আছেই।

২. যাকাতের অর্থ ও তাৎপর্য

যাকাত زكوة মূলত আরবী শব্দ। শব্দটি গঠিত হয়েছে زكو এবং زكى মূল ধাতু থেকে। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ Milton cowan তাঁর সুপরিচিত আরবী-ইংরেজী অভিধান 'মু'জামুল লুগাতুল আরাবিয়্যাতুল মুআসিরা'তে এর আভিধানিক অর্থ লিখেছেন ঃ To thrive, To grow, Increase, To be pure in heart, To be fit, To purify, Chasten, Integrity, Guiltless, Blameless, Sinless, Honesty, Justify, Righteousness.

শব্দগুলোর অর্থ আমাদের কাছে পরিষ্কার। ইবনুল আরবী তাঁর 'লিসানুল আরব' এবং ইমাম রাগিব ইস্পাহানী তাঁর 'আল মুফরাদাত'-এ যাকাতের যেসব অর্থ লিখেছেন, এ ইংরেজী শব্দগুলোতে সে অর্থগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

যাকাত মূলত একটি বড় ইবাদত। তাই যাকাতদাতা আল্লাহ্‌র ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করে। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাত দাতার অর্থসম্পদ এবং তার মন ও আত্মা পবিত্র পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে মুমিনের অন্তর থেকে কৃপণতা কুটিলতা দূর হয়ে যায়। দুঃখীজনের প্রতি দয়ায় তার হৃদয় দিল সমুদ্রের মতো প্রশস্ত এবং আকাশের মতো উদার হয়ে উঠে। এর ফলে তার সম্পদ ও আত্মা শুদ্ধতা লাভ করে, সংহতি অর্জন করে আর আল্লাহ্ তার সম্পদে দান করেন প্রবৃদ্ধি। এ কারণেই আল্লাহর হুকুমে নিজ সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ দান করাকে 'যাকাত' বলা হয়েছে।

৩. কুরআনে যাকাত ও অন্যান্য সমার্থ শব্দ

ইসলামী শরীয়ায় যাকাত শব্দটিই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে। নিসাবোত্তীর্ণ সম্পদ থেকে নির্ধারিত হারে প্রদান করাকেই যাকাত বলা হয়। তবে এ উদ্দেশ্যে কুরআনে এবং হাদীসে আরো দু'টি শব্দ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সেগুলোর একটি হলো 'সাদাকা' আর অপরটি 'ইনফাক'।

কুরআন মজীদে 'যাকাত' শব্দটি বিভিন্ন গঠন প্রক্রিয়ায় ৫৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক যাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ৩০ বার। ২৭ বার সালাতের সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯ বার 'যাকাত প্রদান করো' বলে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বাকী ২১ বার যাকাত প্রদান করা এবং যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা মুমিনদের ও ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

'সাদাকা' শব্দটি এক বচনে এবং বহু বচনে কুরআন মজীদে ১৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকবারই তা যাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসে যাকাত অর্থে 'সাদাকা' শব্দটি বহুবারই ব্যবহৃত হয়েছে।

'ইনফাক' শব্দটি বিভিন্ন গঠন প্রক্রিয়ায় কুরআন মজীদে ৭৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে । এর মধ্যে অনেকবারই তা ব্যবহৃত হয়েছে 'যাকাত' অর্থে।

৪. ইসলামী শরীয়ায় যাকাতের গুরুত্ব

ইসলামী শরীয়ার সমস্ত উৎস অনুযায়ী যাকাত ফরযে আইন। যাকাত অস্বীকারকারী কাফির। আল কুরআনে যাকাত প্রদানের অকাট্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। রসূলে করীম (স) যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন, যাকাত উসূল

করেছেন এবং উসূল করার নির্দেশ দিয়েছেন। অপরিহার্য ফরয হিসেবে সাহাবায়ে কিরাম যাকাত আদান প্রদান করেছেন। যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। যাকাতের ফরযিয়ত সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহ্র অকাট্য ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪.১ কুরআনে যাকাত প্রদানের নির্দেশ

আগেই উল্লেখ করেছি কুরআন মজীদে যাকাত প্রদানের অকাট্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

> **"সালাত কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো।" [আল বাকারা ঃ ৪৩, ৮৩, ১১০, আননিসা ঃ ৭৭, আলহজ্জঃ ৭৮, আননূর ঃ ৫৬, আহ্যাব ঃ ৩৩, মুজাদালা ঃ ১৩, মুযযাম্মিল ঃ ২০]**

অনত্র এভাবে বলা হয়েছে ঃ

> **"তোমাদের পবিত্র উপার্জন থেকে একটা অংশ খরচ করো আর যমীন থেকে আমি তোমাদের জন্যে যা উৎপন্ন করেছি তার একটা অংশ।" [আলবাকারা ঃ ২৬৭]**

আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে এই বলে নির্দেশ প্রদান করেছেন ঃ

> **"তাদের অর্থসম্পদ থেকে সাদাকা [যাকাত] উসূল করো যা তাদের পবিত্র পরিশুদ্ধ করবে।" (তাওবা ঃ ১০৩)**

৪.২ সকল নবীর উম্মতের উপর যাকাত ফরয ছিলো

সালাত ও সাওমের নির্দেশকর্তা প্রত্যেক নবীর উম্মতের উপর যাকাতও ফরয করেছিলেন। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বংশধর নবীদের যেসব কাজের নির্দেশ প্রদান করে অহী নাযিল করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

> **"আমি তাদের ইমাম বানিয়ে দিয়েছি। তারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী হিদায়াত দানকরছিলো, আর অহীর মাধ্যমে আমি তাদেরকে নেক কাজের, সালাত কায়েমের এবং যাকাত দিয়ার হেদায়াত করেছিলাম।"**

কুরআন মজীদে ইসমাইল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

> **"আর সে তার আহ্লকে সালাত কায়েম এবং যাকাত দেয়ার নির্দেশ করতো।" (সূরা মরিয়ম ঃ ৫৫)।**

ঈসা আলাইহিস সালামের একটি ভাষণ আল-কুরআনে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

"আর আমি যতোদিন বেঁচে থাকি, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে সালাত কায়েম এবং যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।" (সূরা মরিয়ম ঃ ৩১)।

৪.৩ রসূলুল্লাহ্র বাণী

আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (স) যাকাত প্রদান করেছেন, সাহাবীগণকে যাকাত প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং কোনো সাহাবীকে কোথাও শাসনকর্তা নিযুক্ত করলে তাকে যাকাত উসূল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ পর্যায়ে কথা সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমরা দু'টি মাত্র হাদীস উল্লেখ করছি। বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স) মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়েমেনে শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবারকালে তাঁকে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করেন ঃ

"হে মুয়ায! তুমি আহলে কিতাবের লোকদের কাছে যাচ্ছো। তাদের প্রথমে 'আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল' এই ঘোষণা দেয়ার আহবান জানাবে। এ আহবান মেনে নিলে তাদের বলবে, আল্লাহ্ তাদের উপর দিনরাত্রে পাঁচ বার সালাত আদায় করা ফরয করেছেন। তারা যদি একথা মেনে নেয়, তাদের জানাবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর সাদাকা [যাকাত] ফরয করে দিয়েছেন, যা তোমাদের ধনীদের কাছ থেকে উসূল করা হবে এবং তোমাদের গরীবদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে।"

অন্য একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

"তোমাদের সম্পদের যাকাত পরিশোধ করো।" (তিরমিযী, হিদায়া)

হাদীস দু'টি যাকাত অকাট্যভাবে ফরয হবার কথা প্রমাণ করে। অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থেই যাকাতের উপর আলাদা অধ্যায় সংকলন করা হয়েছে। উৎসুক পাঠকদের জন্যে কেবল মিশকাত নামের সংকলনটিই এবিষয়ে জানার জন্যে যথেষ্ট হবে।

৪.৪ যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের তৃতীয়

যাকাতের গুরুত্ব পর্যায়ে একথাটিও বিবেচনাযোগ্য যে, যাকাত ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের অন্যতম। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ তৃতীয় স্তম্ভ। প্রথম স্তম্ভ হলো

ঈমান, দ্বিতীয় হলো সালাত, তৃতীয় যাকাত, চতুর্থ রমযান মাসের রোযা আর পঞ্চম হলো সামর্থে কুলালে বায়তুল্লায় হজ্জ করা। এই পর্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

> **"ইসলাম পাঁচটি ভিতরে উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হলো, এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ থাকলে আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করা।"**

হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই সংকলিত হয়েছে। অনুরূপ বক্তব্য সম্বলিত আরো হাদীস রয়েছে। হাদীসে জিব্রাইল নামের হাদীসটি বহুল পরিচিত। তাতে প্রশ্নকর্তার 'ইসলাম কি এই প্রশ্নের জবাবে রসূলুল্লাহ (সা) উপরোক্ত হাদীসটির মর্তোই বক্তব্য দিয়েছেন।

রসূলুল্লাহর বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেছেন, এর মধ্যে প্রথমটি হলো মূলত 'ঈমান' আর বাকী চারটি হলো মৌলিক ইবাদত। তাহলে দেখা যায়, ইবাদতের পর্যায়ে যাকাতের স্থান দ্বিতীয়, প্রথম স্থান হলো সালাতের। আর কুরআন মজীদে তো বার বারই সালাতের সাথে সাথে যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটু আগেই আমরা সেবিষয়ে আলোকপাত করে এসেছি।

তাহলে ইসলামী শরীয়তে যাকাত যে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা তার এই অবস্থান ও মর্যাদা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

৪.৫ যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সাহাবাগণের যুদ্ধ

রসূলুল্লাহর (স) ইন্তিকালের পর কিছু লোক কলেমা এবং নামায রোযা মেনে নিয়ে কেবল যাকাত দিতে অস্বীকার করে। তাদের বিরুদ্ধে প্রথম খলীফা আবু বকর (রা) যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করে দেন, 'যে ব্যক্তি নামায থেকে যাকতকে বিচ্ছিন্ন করবে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।' সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবু বকরের এ সিদ্ধান্তকে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেন এবং যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ফলে কলেমার ঘোষণা দেয়ার পর কেউ যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে ইসলামী সরকারের যুদ্ধ ঘোষণা করা যে অপরিহার্য সে বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা (ঐক্যমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ হলো, যাকাত

ধনীদের সম্পদে গরীবদের অধিকার। আর অধিকার আদায়ের জন্যে চূড়ান্ত চেষ্টা হিসেবে যুদ্ধ অপরিহার্য।

৪.৬ যাকাতের সাথে ঈমানের প্রশ্ন জড়িত

যাকাত আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ। যাকাত অস্বীকার করা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে (সাঃ) অস্বীকার করার শামিল। বস্তুত যাকাত প্রদান করা মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাহেবে নিসাব কোনো ব্যক্তি যাকাত না দিয়ে মুসলমানদের কাতারে শাশিল থাকতে পারে না। এরশাদ হচ্ছে ঃ

"ঈমানদার লোকদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত পরিশোধ করে এবং তারা আল্লাহর সম্মুখে মাথা নতকারী হয়ে থাকে।" (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৫৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

"ঈমানদার নারী ও পুরুষরা প্রকৃতপক্ষে পরস্পর বন্ধু ও সাহায্যকারী। তাদের পরিচিতি হচ্ছে এই যে, তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়।" (সূরা আততওবা ঃ ৭১)

৪.৭ যাকাত অস্বীকারকারী কাফির

কুরআন মজীদে মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ্ মুমিনদের এই হিদায়াত প্রদান করেন ঃ

"তবে তারা যদি (কুফর ও শিরক থেকে) তওবা করে (ফিরে আসে) এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই হয়ে যাবে।" [সূরা তাওবা ঃ ১১]

এ আয়াতে যাকাত প্রদান করাকে ইসলামে প্রবেশ করার অপরিহার্য শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

"লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতোক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল আর সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে।"

এ হাদীস থেকেও যাকাত অস্বীকার করার পরিণতি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

কুরআনে মজীদে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যাকাত না দেয়া মুশরিকদের কাজ ঃ

মুশরিকদের জন্যে ধ্বংস, যারা যাকাত দেয়না।" [সূরা হামীমুস সাজদা ঃ ৬-৭]

কুরআন, হাদীস ও সাহাবাগণের ইজমার ভিত্তিতে ফকীহগণ যাকাত অস্বীকারকারীদের কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪.৮ যাকাত না দেয়ার পরকালীন শাস্তি

যাকাত না দেয়ার পরকালীন শাস্তি যে কতো ভয়ংকর সেবিষয়ে কুরআনের একটি আয়াত এবং একটি হাদীস উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

"যারা সোনা রূপা [অর্থ সম্পদ] পুঞ্জিভূত করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করেনা, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও! এমন একদিন আসবে, যেদিন সেসব সোনা রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, তারপর তা দিয়ে তাদের মুখমন্ডল, পার্শদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে এবং বলা হবে ঃ এই হলো তোমাদের সেসব অর্থ সম্পদ যা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে। অতএব এখন নিজেদের জমা করে রাখা সম্পদের স্বাদ গ্রহণ করো।" [সূরা তাওবা ঃ ৩৪-৩৫]

রসূলে করীম (সা) বলেছেন ঃ

আল্লাহ যাকে অর্থসম্পদ দিয়েছেন, সে যদি সে অর্থসম্পদের যাকাত প্রদান না করে, তবে তা কিয়ামতের দিন একটি বিষধর অজগরের রূপ ধারণ করবে, যার দু'চোখের উপর দু'টি কালো চিহ্ন থাকবে। সে বলবে ঃ আমিই তোমার অর্থসম্পদ, আমিই তোমার সঞ্চয়। এতোটুকু বলার পর নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ "যারা আল্লাহ্‌র দেয়া অর্থসম্পদে কার্পণ্য করে, তারা যেনো মনে না করে যে, এটা তাদের জন্যে মংগল, বরং এটা তাদের জন্যে অত্যন্ত খারাপ। তারা যে অর্থসম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে তাই কিয়ামতের দিন তাদের গলার বেড়ি হবে।" সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮০ [বুখারী ঃ আবু হুরাইরা]

বিভিন্ন হাদীসে এই লোকদের আরো অনেক শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এথেকে বুঝা যায় যাকাত না দেয়ার পরকালীন পরিণতি কতটা ভয়াবহ।

এযাবতকার আলোচনা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো, যাকাত ইসলামের অপরিহার্য ফরয বিধান। যাকাত ইসলামের অন্যতম মৌলি স্তম্ভ। যাকাত সালাতের মতোই ফরয ইবাদত। যাকাত অস্বীকারকারী মুসলিম নয়, কাফির।

৫. যাকাত দানকারী মূলত তার সম্পদ বৃদ্ধি করে

যাকাত দিলে ব্যক্তির সম্পদ কমে না, বরঞ্চ বাড়ে। যারা গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর নির্দেশমতো তাঁর পথে ব্যয় করেন, পরম করুণাময় আল্লাহ এর বিনিময়ে কেবল পরকালে নয়, দুনিয়াতেও ব্যাপক বরকত, সচ্ছলতা ও উন্নতি দান করেন ঃ

> **"আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যে যাকাত দাও, মূলত যাকাত দানকারী সম্পদ বৃদ্ধি করে।" (সূরা রুম ঃ ৩৯)**

> **"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের এ খরচের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি শস্য বীজের মতো, যে বীজ থেকে সাতটি শীষ বের হয় এবং প্রত্যেকটি শীষে হয় একশ'টি দানা। আল্লাহ যার আমলকে চান এভাবেই বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ তো সীমাহীন ব্যাপকতার অধিকারী, জ্ঞানী।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৬১)**

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে যাকাত প্রদানকারীদের অনেক অনেক পরকালীণ শুভ সংবাদ দিয়েছেন। তারা পরকালে বিরাট কল্যাণ লাভ করবে। এ সম্পর্কে আল কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। এগুলো কুরআন অধ্যায়নকারী সকলেরই জানা রয়েছে।

৬. যাকাত সম্পদ ও আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে

কৃপণ ও লোভী লোকেরা যাকাত দিতে পারে না। লোভ ও কৃপণতা মানুষের অন্তরাত্মাকে সংকীর্ণ ও সংকোচিত করে দেয়। পক্ষান্তরে যাকাত মানুষের এ সংকীর্ণতাকে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দেয় আর তার অন্তরকে করে দেয় মুক্ত-মহান। আর যারা কৃপণতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারে, তারাই সফলকাম মানুষ ঃ

"যারা মনের সংকীর্ণতা মুক্ত হতে পারবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে।" (সূরা হাশর ঃ ৯)

বস্তুত যাকাত পরিশোধ করা ও আল্লাহ্র পথে দান করার মাধ্যমেই এরূপ মুক্ত মহান হৃদয়ের অধিকারী হওয়া সম্ভব। যারা যাকাত দেয় না তাদের সম্পদে তো পরের অধিকার মিশ্রিত হয়, তাই তা অপবিত্র হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যারা নিজেদের সম্পদ থেকে অপরের অধিকার ও প্রাপ্য দিয়ে দেয়, তাদের সম্পদ তো স্বাভাবিকভাবেই পবিত্র-পরিশুদ্ধ হয়ে যায়। আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"হে নবী, তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত উসূল করে তাদের পবিত্র পরিশুদ্ধ করে দাও।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৩)

৭. যাকাত দান নয়, অধিকার

যাকাত ধনীদের পক্ষ থেকে দান বা অনুগ্রহ নয়। বরং যাকাত পরিশোধ করা বিত্তবানদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য বা ফরয। যাকাত দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদে অলংঘনীয় নির্দেশ নাযিল করেছেন। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা নিজেই যাকাতকে ধনীদের সম্পদে অসহায় ও বঞ্চিতদের অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"আর তাদের ধন-দৌলতে বঞ্চিত ও প্রার্থীদের অধিকার রয়েছে।" (সূরা আয-যারিয়াত ঃ ১৯)

অন্যত্র আল্লাহ ধনবান লোকদের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

"আর নিকট আত্মীয়কে তার অধিকার দিয়ে দাও এবং মিসকীন আর মুসাফিরকেও। অপব্যয়-অপচয় করবে না।" (বনী ইসরাইল ঃ ২৬)।

৮. যাকাত ও সুদ

যাকাত আল্লাহ প্রদত্ত অর্থ-ব্যবস্থার অপরিহার্য স্তম্ভ। পক্ষান্তরে সুদ এ অর্থ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত ও সংঘর্ষশীল এক ধ্বংসাত্মক পদ্ধতি। যাকাতে রয়েছে মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ। পক্ষান্তরে সুদ হচ্ছে মানবতা ধ্বংসকারী এক নিকৃষ্ট লেলিহান শিখা। এতদোভয় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হচ্ছে ঃ

"আল্লাহ সুদকে নির্মূল নিশ্চিহ্ন করে দেন আর সদকায় দান করেন ক্রমবৃদ্ধি। আর আল্লাহ (সুদখোর) অকৃতজ্ঞ ও পাপী লোকদের মাত্রই পছন্দ করেননা।" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৬)

"লোকদের অর্থ-সম্পদের সাথে শামিল হয়ে বৃদ্ধি পাবে এ জন্য তোমরা যে সুদ দাও তা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায়না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দাও, মূলত এই যাকাতদানকারীরাই তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে।" (সূরা আর-রুম ঃ ৩৯)

৯. যাকাত ব্যবস্থা চালু করা ইসলামী সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব

আল্লাহর সাহায্যকারী প্রকৃত ইসলামী সরকারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

"তারা হচ্ছে সেইসব লোক যাদের আমি রাষ্ট্রক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত-ব্যবস্থা চালু করবে, মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায়-অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" (সূরা আল-হজ্ব ঃ ৪১)

১০. যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

এ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"হে নবী, তাদের সম্পদ থেকে যাকাত উসূল করে তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করো।" (সূরা তওবা ঃ ১০৩)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রসূলে করীম (সাঃ)কে মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত উসুল করতে আদেশ করেছেন। মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দান করতে বলা হয়নি। এছাড়া আর একটি আয়াতে যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য যাকাতের অর্থের একাংশ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় মুসলমানদের রাষ্ট্র প্রধান বা ইমাম সকলের নিকট থেকে যাকাত আদায় করবে এবং সমষ্টিগতভাবে তা খরচ করবে। একটি হাদীসে নবী করীম (স)ও একথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "তোমাদের বিত্তবানদের থেকে যাকাত উসুল করে তোমাদের দরিদ্রদের মধ্যে তা বন্টন করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।" হুজুর (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী সরকার কর্তৃক যাকাত উসূল করা হতো এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তা বন্টন করা হতো।

প্রশ্ন হতে পারে, বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত না থাকা অবস্থায় মুসলমানরা কিভাবে তাদের যাকাত পরিশোধ করবে? এমতাবস্থায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারী ইসলামী সংগঠন কর্তৃক যাকাত আদায় করে কুরআন

নির্ধারিত খাতসমূহে তা বন্টনের ব্যবস্থা করাই যাকাত আদায়ের সর্বোত্তম পন্থা। এরূপ সংগঠনের উচিত মুসলমানদের যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং মুসলমানদের উচিত এরূপ সংগঠনের হাতে যাকাত গ্রহণ ও বন্টনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা। এ পন্থাই আল্লাহ নির্ধারিত নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যশীল। নতুবা মুসলমানদেরকে ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দানের কথা বলা হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে যাকাত দানের ক্ষেত্রে অনেক ফেতনা রয়েছে। এতে মনে প্রদর্শনেচ্ছা সৃষ্টি হতে পারে। যাকাত দানকে অনুগ্রহ বিবেচনা করা হতে পারে। এ ছাড়াও এ পন্থায় যাকাত বিনষ্ট হবার আশংকা রয়েছে। যাকাত উসুলকারী সংস্থার অভাবে কোনো ব্যক্তিকে যদি ব্যক্তিগতভাবে যাকাত পরিশোধ করতেই হয়, তবে প্রাপ্য ব্যক্তিদের বাড়ী গিয়ে পৌছে দেয়া উচিত।

১১. যাকাত কোন্ ব্যক্তির উপর ফরয?

কোনো বিধান আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই স্পষ্ট করে নিতে হয় যে, বিধানটি কাদের জন্য প্রযোজ্য বা কাদের উপর বর্তাবে। যাকাত সালাতের মতোই ইসলামের একটি ফরয বিধান। সালাত ফরয হবার জন্যে যেমন কিছু শর্ত আছে, তেমনি যাকাত ফরয হবার জন্যেও কিছু শর্ত রয়েছে। শরীয়া বিশেষজ্ঞদের মতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই যাকাত ফরয, যার মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পাওয়া যাবে ঃ

১. **মুসলিম ঃ** যাকাতের ফরযিয়ত বর্তায় মুসলমানের উপর। কোনো অমুসলিমের উপর যাকাত ধার্য করা যায়না। কারণ, যাকাত একটি ইবাদত। আর ইবাদতের ভিত্তি হলো ঈমান ও ইসলাম।

২. **স্বাধীন ঃ** যাকাত ফরয হবার দ্বিতীয় শর্ত হলো, ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে হবে। দাসের উপর যাকাতের ফরযিয়ত বর্তায়না।

৩. **আকেল হওয়া ঃ** আকেল মানে জ্ঞান ও বুদ্ধিবিবেক সম্পন্ন হওয়া। অর্থাৎ পাগল না হওয়া। পাগলের অর্থ সম্পদে যাকাত ফরয হয়না। (হানাফী মযহাব)

৪. **বালেগ হওয়া ঃ** অর্থাৎ শিশুর অর্থ সম্পদে যাকাত ফরয হয়না। (হানাফী মযহাব)

৫. **নিসাব ঃ** অর্থসম্পদ থাকলেই যাকাত ফরয হয়না। যাকাত ফরয হয় সেসব লোকের উপর, যাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সম্পদ রয়েছে। (নিসাবের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসছে)।

৬. পূর্ণাঙ্গ মালিকানা ঃ সম্পদের উপর মালিকানা সুনির্দিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল তাতে যাকাত ধার্য হবে। মালিকানা নির্ণিত না হলে এবং সম্পদের উপর কব্জা প্রতিষ্ঠিত না হলে সে সম্পদে যাকাত ধার্য হয়না।

৭. এক বছর অতিবাহিত হওয়া ঃ অর্থ সম্পদ হাতে এলেই তাতে যাকাত ফরয হয়না। যাকাত ফরয হয় সে ব্যক্তির উপর যার হাতে অর্থ সম্পদ আসার পর তা এক বছর পর্যন্ত হাতে থাকে। তবে ফল, ফসল, খনিজ সম্পদ, গুপ্তধন, মধু এগুলো যখন যা হাতে আসে তখনই তার যাকাত দিতে হবে। আল কুরআনে ফসল কাটার সময়ই তার যাকাত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শর্তের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হানাফীদের মতে পাগল ও শিশুর সম্পদে যাকাত ফরয হয়না। অন্যরা বলেছেন ফরয হয়।

১২. যাকাত কোন মালের উপর ফরয?

কোনো ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হবার জন্যে যেমন কিছু শর্ত আছে, ঠিক তেমনি কোনো মালের উপর যাকাত ফরয হবার জন্যেও কিছু শর্ত শরায়েত রয়েছে। আল কুরআনে 'মালের' যাকাত দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মাল হলেই তার উপর যাকাত ফরয হয়না। যাকাত ফরয হয় সে সব মালের উপর, যেগুলোতে নিম্নোক্ত শর্তাবলী বিদ্যমান থাকেঃ

১. মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া ঃ যাকাত সে মালের উপরই ফরয হয়, যার উপর কারো মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার কব্জায় এসেছে এবং নিয়ন্ত্রণ বলবত হয়েছে। সে মালের উপর যাকাত ফরয নয়, যা মালিকানাহীন এবং যা হস্তগত হয়নি।

২. বর্ধনশীলতা/প্রবৃদ্ধি ঃ যে মাল থেকে যাকাত গ্রহণ করা হবে, তা বর্ধনশীল হতে হবে। অর্থাৎ সে মাল তার মালিককে (owner) প্রবৃদ্ধি ও মুনাফা এনে দেবার যোগ্যতা রাখে এমন হতে হবে।

৩. নিসাব পরিমাণ হওয়া ঃ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ, পরিসংখ্যা বা সীমা পূর্ণ হবার পরই কোনো মালের উপর যাকাত ফরয হবে।

৪. প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া ঃ প্রকৃত প্রয়োজন বলতে বুঝায় সেসব জিনিসকে, যেগুলোর উপর মানুষের জীবন নির্বাহ ও ইজ্জত আবরু সংরক্ষণ নির্ভরশীল। যেমনঃ পানাহার, পোশাক পরিচ্ছেদ, বসবাসের বাড়িঘর,

যানবাহন, পেশাজীবিদের যন্ত্রপাতি ও মেশিন, গৃহস্থালির ব্যবহার্য আসবাবপত্র ইত্যাদি। এসব জিনিস বাদ দেয়ার পর নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকলেই তার উপর যাকাত ধার্য হবে।

৫. ঋণমুক্ত হওয়া ঃ কোনো ব্যক্তির যদি নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকে এবং সেই সাথে অনুরূপ পরিমাণ ঋণও থাকে, তবে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মালের উপর যাকাত ফরয হবে তখন, যখন ঋণ পরিশোধ করলেও তার কাছে নিসাব পরিমাণ অর্থসম্পদ থাকবে। বাণিজ্যিক ঋণের ব্যাপারে ভিন্ন কথা আছে।

৬. এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া ঃ যে মালের উপর যাকাত প্রযোজ্য, তা যাকাত দাতার মালিকানায় আসার পর এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। পশুসম্পদ, নগদ অর্থসম্পদ, সোনারূপা ও ব্যবসায়ের পুঁজি পণ্যের ক্ষেত্রে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত। তবে ফল ফসল, মধু, খনিজ ও গচ্ছিত ধনের ক্ষেত্রে এক বছর প্রযোজ্য নয়।

১৩. কি কি সম্পদের যাকাত দিতে হবে?

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখতে হবে, কি কি জিনিসের যাকাত দিতে হবে? এ ব্যাপারে আল কুরআন থেকেই মৌলিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"সেই জীবিকা থেকে তোমরা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করো, যা আমি তোমাদের দিয়েছি।" [আল বাকারা ঃ ২৫৪]

এখানে 'জীবিকা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'জীবিকা' কথাটি সাধারণভাবে সমস্ত 'জীবন সমাগ্রীর' ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যাকাত গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ নবীকে বলেন ঃ

'তাদের 'মাল' থেকে সাদাকা (যাকাত) উসুল করো।' [সূরা আত তাওবা ঃ ১০৩]

এখানে 'মাল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত এ শব্দটিও সকল প্রকার অর্থ সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে ইসলামী আইনবিদগণ কোনো কিছু মাল হবার জন্যে মালিকানা বা অধিকার ভুক্তির শর্তারোপ করেছেন। সে হিসেবে কোনো ব্যক্তির অধিকারভুক্ত সবকিছুই তার মাল।

আল্লাহ প্রদত্ত কি কি 'জীবিকা' ও 'মাল' থেকে যাকাত দিতে হবে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে সেগুলো চিহ্নিত হয়েছে। যাকাত দেয় সম্পদ বা জীবিকা মৌলিকভাবে নিম্নরূপ ঃ

১. পশু সম্পদ।

২. মূল্য হিসেবে বিনিময়যোগ্য সম্পদ অর্থাৎ সোনা, রূপা, মুদ্রা বা নদ অর্থ।

৩. কৃষিজাত ফল ফসল।

৪. ব্যবসায় সামগ্রী।

৫. খনিজ সম্পদ ও গুপ্তধন।

১৪. নিসাব

নিসাব হলো অর্থসম্পদের সেই নির্দিষ্ট ও নূন্যতম পরিমাণ, সংখ্যা বা সীমা যার নিচে হলে যাকাত ফরয হয়না। এখানে বিভিন্ন প্রকার মালের নিসাব উল্লেখ করা হলো ঃ

১৪.১ ঃ ভেড়া, ছাগল উভয় প্রকার মিলে নিসাব হলো ৪০টি। এর কমে যাকাত নেই।

১৪.২ ঃ গরু ও মহিষ উভয় প্রকার মিলে নিসাব হলো ৩০টি। এর কমে যাকাত নেই।

১৪.৩ ঃ উটের নিসাব ৫টি।

১৪.৪ ঃ সোনার নিসাব ২০ মিসকাল সোনা। আধুনিক কালের ওজনে ২০ মিসকাল ২০০.৮৯ গ্রামের সমতুল্য। ভারত উপমহাদেশে ৭$\frac{১}{২}$ তোলা সোনাকে ২০ মিসকালের সমতুল্য গণ্য করা হয়।

১৪.৫ ঃ রূপার নিসাব ২০০ দিরহাম। আধুনিক কালের হিসাবে এর ওজন ৬২৪ গ্রাম। ভারত উপমহাদেশে ৫২$\frac{১}{২}$তোলা রূপাকে ২০০ দিরহামের সমতুল্য গণ্য করা হয়।

১৪.৬ ঃ আবু হানীফা ও শাফেয়ীর মতে ফসলের নিসাব হলো 'বিশ ওসাক' বা ত্রিশ মণ।

১৪.৭ ঃ নগদ অর্থ বা মুদ্রা, কাগজের নোট ও ব্যবসায় পণ্যের মূল্য প্রভৃতির নিসাব হলো ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রূপার মূল্য সমপরিমাণ।

১৫. যাকাতের হার

১৫.১ ঃ পশু সম্পদের যাকাত ঃ

'সায়িমা' জাতীয় পশুর উপর যাকাত ধার্য হয়। 'সায়িমা' হলো সেসব পশু যেগুলো দুগ্ধ সংগ্রহ ও বংশ বৃদ্দির জন্যে পালন করা হয়। এসব পশু তিন প্রকারঃ

ক. উট।

খ. গরু ও মহিষ।

গ. ছাগল, ভেড়া, দুম্বা।

অন্যান্য পালিত পশুর উপর যাকাত ধার্য হয়না। তবে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হলে, সেগুলোর উপর ব্যবসায় সামগ্রী হিসেবে যাকাত ধার্য হবে।

এক্ষেত্রে আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার। তাহলো, পশুর যাকাত হিসেবে কেবল পশুই প্রদান করতে হবে, মূল্য নয়।

ক. উটের যাকাতের হার

১. উট যদি ৫টির কম হয় তবে তার যাকাত নেই।
২. উটের সংখ্যা ৫-৯টিতে একটি ছাগী।
৩. উটের সংখ্যা ১০-১৪ টিতে দুইটি ছাগী।
৪. উটের সংখ্যা ১৫-১৯টিতে তিনটি ছাগী।
৫. উটের সংখ্যা ২০-২৪ টিতে চারটি ছাগী।
৬. উটের সংখ্যা ২৫-৩৫ এমন একটি উটনী যার বয়স ২ বছরে পড়েছে।
৭. উটের সংখ্যা ৩৬-৪৫ এমন একটি উটনী যার বয়স ৩ বছরে পড়েছে।
৮. উটের সংখ্যা ৪৬-৬০ চার বছরে পড়েছে এমন একটি উটনী।
৯. উটের সংখ্যা ৬০-৭৫ পাঁচ বছরে পড়েছে এমন একটি উটনী।
১০. উটের সংখ্যা ৭৬-৯০ তিন বছরে পড়েছে এমন ২টি উটনী।
১১. উটের সংখ্যা ৯১-১২০ চার বছরে পড়েছে এমন ২টি উটনী।

* এর অতিরিক্ত হলে আবার একই নিয়মে ধর্তব্য।

খ. গরু মহিষের যাকাতের হার

১. ২৯টি পর্যন্ত যাকাত নেই।
২. এক প্রকার বা উভয় প্রকার মিলে ৩০-৩৯ পর্যন্ত সংখ্যার জন্যে পূর্ণ এক বছরের একটি গরু/মহিষের বাচ্চা।

৩. ৪০-৫৯ = ২ বছরের বাছুর।

৪. ৬০টির অতিরিক্ত থাকলে প্রতি ৩০টিতে ১ বছরের এবং প্রতি ৪০টিতে ২ বছরের একটি বাচ্চা দিতে হবে।

গ. ছাগল ও ভেড়ার যাকাতের হার

১. ৪০ - এর নিচে হলে যাকাত নেই।

২. ৪০ - ১২০ = একটি ছাগল/ভেড়া।

৩. ১২১ - ২৮০ = দুইটি ছাগল/ভেড়া।

৪. ২০১ - ৩৯৯ = ৩টি ছাগল/ভেড়া।

৫. ৪০০ = ৪টি।

৬. ৪০০-এর অধিক হলে প্রতি ১০০টিতে ১টি করে।

● যাকাত হিসেবে যে ভেড়া/ছাগল দেয়া হবে তার বয়স এক বছরের নিচে হবে না।

১৫.২ ঃ সোনা রূপা ব্যবসায় সামগ্রী ও নগদ অর্থের যাকাতের হার

● রসূলে করীমের (সা) যুগে সোনা রূপা এবং সোনা রূপার মুদ্রাই ছিলো নগদ অর্থ। তাই এগুলোকেই নিসাবের ভিত্তি ধরা হয়েছে।

● সোনা রূপার যাকাত শতকরা আড়াই (২.৫%) বা প্রতি চল্লিশে এক।

● একইভাবে নগদ অর্থ, ধাতব মুদ্রা, কাগজের নোট এবং অলংকারের যাকাত শতকরা আড়াই (২.৫%)।

● ব্যবসায় সামগ্রীর মূল্য হিসাব করে তার শতকরা আড়াই (২.৫%) যাকাত দিতে হবে।

১৫.৩ ঃ খনিজ সম্পদের যাকাত

খনিজ সম্পদের নিসাব নেই। এর যাকাতের হার শতকরা ২০ ভাগ। সরকারী হলে যাকাত নেই।

১৫.৪ ঃ ওশর বা কৃষি ফসলের যাকাত

ওশরের আভিধানিক অর্থ দশ ভাগের এক ভাগ। মূলত ওশর হচ্ছে কৃষি ফসলের যাকত। অর্থাৎ জমির উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। অবশ্য এটা হচ্ছে সেইসব জমির ফসলের হার

যেগুলো থেকে সেচবিহীন কিংবা স্বাভাবিক বর্ষা ও বৃষ্টির পানি দ্বারা ফল-ফসল উৎপন্ন হয়। আর বিভিন্ন উপায়ে সেচকার্যের দ্বারা যেসব জমির ফসল উৎপন্ন হয়, সেগুলোর যাকাত দিতে হয় বিশ ভাগের এক ভাগ।

কুরআন মজীদে ওশর বা উৎপন্ন শষ্যের যাকাত দেয়ার অলংঘনীয় নির্দেশ রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ

"হে মুমিনরা! তোমাদের উপার্জনের উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ করো এবং সে সম্পদের মধ্য থেকেও যা আমি তোমাদের জন্য যমীন থেকে উৎপন্ন করেছি।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৭)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

"তিনিই আল্লাহ যিনি নানা প্রকার লতাবিশিষ্ট এবং কান্ডের উপর দন্ডায়মান বৃক্ষ-বাগান পয়দা করেছেন। যিনি খেজুর ও ক্ষেতের ফসল ফলিয়েছেন যা থেকে নানা প্রকার খাদ্য পাওয়া যায়। যিনি যয়তুন ও আনারের গাছ সৃষ্টি করেছেন- যার ফল বাহ্যিকভাবে পরস্পর সদৃশ অথচ স্বাদ বিভিন্ন। তোমরা তার উৎপাদন খাও যখন তাতে ফল ধারণ করবে। আর যখন এসবের ফসল আহরণ করবে তখন আল্লাহর হক আদায় করো, সীমালংঘন করবেনা।" (সূরা আল আনআম ঃ ১৪১)

হাদীসে রসূলে আল্লাহকে দেয় হক এক দশমাংশ এবং বিশ ভাগের এক ভাগ বলে উল্লেখ হয়েছে।

ওশরের নিসাবে মতভেদ আছে। অনেকের মতে, ওশর ফরয হওয়ার জন্য নিসাবের কোনো শর্ত নেই। ফসল কম হোক বেশী হোক ওশর দিতে হবে। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ীর মতে, ওশরের নিসাব পাঁচ ওয়াসাক বা ত্রিশ মণ। এর কম হলে ওশর ফরয হয় না। ওশর সরাসরি ফসলেও দেয়া যায় কিংবা ফসলের মূল্যও দেয়া যায়।

ইসলাম বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মুসলমানদের মালিকানায় যেসব জমি আছে তা ওশরী জমি।

জমির খাজনা দিলে ওশর মাফ হয় না।

যাকাত ও ওশর একই খাতে ব্যয় হবে।

সকল প্রকার ফসলের হিসাব আলাদা করতে হবে।

১৬. যাকাত ধার্য হওয়া সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়

১৬.১ ঃ নগদ মুদ্রার নিসাব ধরতে হবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা বা ৬২৪ গ্রাম রূপার মূল্য পরিমাণকে।

১৬.২ ঃ কারো কাছে যদি কিছু সোনা, কিছু রূপা, কিছু নগদ অর্থ এবং ব্যবসায় পণ্য থাকে, তবে তার ব্যাপারে বিধান হলো, তিনি সবগুলোর মূল্য হিসেব করে দেখবেন। যদি সবগুলোর একত্র মুল্য ৫২ ত(১,২) তোলা রূপার মূল্যের পরিমাণ বা তার চাইতে বেশী হয় তাহলে তাকে ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

১৬.৩ ঃ ব্যবহার্য অলংকারের যাকাতের ব্যাপারে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে ব্যবহার্য অলংকারের যাকাত দিতে হবে, আর কেউ কেউ বলেছেন দিতে হবেনা। তবে কুরআন হাদীসের দলিল দেয়ার পক্ষেই মজবুত বলে মনে হয়। গৃহস্থালীর ব্যবহার্য সামগ্রীর যাকাত নেই।

১৬.৪ ঃ ব্যবসায় পণ্যের যাকাত হিসাবের ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। প্রতিষ্ঠিত মত হলো, প্রবহমান ও আবর্তনশীল সামগ্রীই ব্যবসায় পণ্য। অর্থাৎ সেগুলোই ব্যবসায় পণ্য যেগুলো লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় অতপর সরাসরি বা শিল্পজাত উৎপাদন হিসেবে বিক্রয় করা হয়। স্থিতিশীল ও আবর্তনহীন পণ্যের যাকাত নেই। যেমন ব্যবসায়ের দালানকোঠা, ঘরবাড়ি, মেশিনপত্র ইত্যাদি। তবে কেউ কেউ বলেছেন, এগুলোও যাকাতের হিসেবে নিতে হবে।

১৬.৫ ঃ কেউ যদি গাড়ি, ঘোড়া, ঘরবাড়ি, জায়গা জমি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ক্রয় করে তবে সেগুলোকে পণ্য সামগ্রী গণ্য করে সেগুলোর মূল্য হিসেব করে তার ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। এক্ষেত্রে কিছুটা মতভেদ থাকলেও এটাই বলিষ্ঠ মত।

১৬.৬ ঃ যৌথ মালিকানা ও যৌথ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের অংশ হিসেব করে প্রত্যেকে নিজনিজ অংশের যাকাত দেবেন। তবে কারো অংশ যদি নিসাব পরিমাণ না হয়, তাকে যাকাত দিতে হবেনা। হ্যাঁ, তার যদি আরো ব্যবসা থাকে, নগদ অর্থ থাকে, কিংবা সোনারূপা থাকে, তবে সেগুলোর সাথে ব্যবসার অংশকে যোগ করবেন। তাতে নিসাব পরিমাণ হয়ে গেলে যাকাত দিতে হবে।

১৬.৭ ঃ ফসলের যাকাত দেয়ার পর অবশিষ্ট ফসল বিক্রয় করা নগদ অর্থের যাকাত দিতে হবে না।

১৬.৮ ঃ সোনা, রূপা ও ব্যবসায় পণ্যের যাকাত হিসেবে সেগুলোর মূল্য দিলেও চলবে।

১৭. যাকাত কারা পাবে?

যাকাত পাবে আট ধরনের লোক। আল কুরআনের সূরা তাওবার ৬০ আয়াতে তাদের বিবরণ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

> **এসব সদাকা (যাকাত) ফকীরদের জন্যে, মিসকীনদের জন্যে, সদাকা কর্মে নিযুক্ত কর্মীদের জন্যে, ঐসব লোকদের জন্যে যাদের মনজয় করা উদ্দেশ্য, দাসত্বের শৃংখলমুক্ত করার জন্যে, ঋণগ্রস্তদের সাহায্যে; আল্লাহ্র পথে এবং পথিকদের সাহায্যের জন্যে। এ হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অপরিহার্য বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী এবং প্রজ্ঞাময়। (সূরা আত তাওবা ঃ ৬০)**

এ আয়াত থেকে যাকাত প্রাপ্যদের তালিকা সুস্পষ্ট। তবে এদের পরিচয়টাও সুস্পষ্ট থাকা দরকার ঃ

১. ফকীর ঃ ফকীর হলো সেসব লোক, যারা নিজেদের জীবিকার ব্যাপারে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। যেমন অসহায়, এতীম, বিধবা, সহায় সম্বলহীন, বেকার, বিকলাংগ, দুর্ঘটনা কবলিত। অর্থাৎ যেসব লোক জীবিকার ব্যাপারে অন্যদের মুখাপেক্ষী তারাই ফকীর।

২. মিসকীন ঃ মিসকীন হলো তারা, যাদের মধ্যে অভাব, দৈন্যতা ও ভাগ্যাহত অবস্থা চরম। তবে আত্মসম্মানবোধের কারণে মানুষের কাছে হাত পাততে পারেনা। তাদের ভদ্রপ্রকৃতি দেখে মানুষ তাদের অভাবী মনে করেনা। অথচ তারা চরম অভাবী।

৩. যাকাত কাজে নিযুক্ত কর্মচারী ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের যাকাত বিভাগে যারা কর্মরত থাকেন, তাদের বেতন ভাতা যাকাত থেকেই দেয়া হবে।

৪. মনজয় ঃ যেসব লোককে যাকাত দিলে তারা ইসলামের পক্ষে আসবে, তাদেরকেও যাকাত দেয়া যাবে।

৫. ঋণগ্রস্ত ঃ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যা অর্থ সম্পদ আছে, তা দিয়ে যদি ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তবে আর তার নিসাব পরিমাণ অর্থসম্পদ থাকেনা, কিংবা কিছুই থাকেনা, এমন ব্যক্তিদের ঋণ থেকে মুক্তির জন্যে যাকাত দেয়া যাবে।

৬. দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে।

৭. আল্লাহ্‌র পথে ঃ আল্লাহ্‌র পথে বলতে এমনসব নেক কাজকেই বুঝায় যাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। যারা নিজেদের পূরো সময় আল্লাহ্‌র দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জিহাদে ব্যয় করে, তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে যাকাত দেয়া যাবে।

৮. পথিক মুসাফির ঃ পথিক যদি নিজের ঘরে ধনীও হয়, কিন্তু ভ্রমনকালে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তবে যাকাত পাবার হকদার।

১৮. কারা যাকাত পাবেনা ?

নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের যাকাত দেয়া যাবেনা।

১. পিতামাতা, দাদাদাদী, নানানানী ও তাদের পিতামাতা।
২. সন্তান, নাতি নাতনী, প্রপৌত্র, প্রৌপুত্রী।
৩. স্বামী।
৪. স্ত্রী।
৫. বনি হাশেম।
৬. উপার্জনক্ষম।
৭. অমুসলিম।
৮. যাদের ভরণপোষণের দায়িত্বশীল আছে।

৯. সাহিবে নিসাব। অর্থাৎ যার নিসাব পরিমাণ অর্থসম্পদ আছে তাকে যাকাত দেয়া যাবেনা। তাছাড়া কাউকেও এতো পরিমাণ যাকাত দেয়া যাবেনা, যাতে সে সাহিবে নিসাব হয়ে যায়। তবে প্রকৃত প্রয়োজন হলে দেয়া যাবে।

১৯. যাকাত উসূল ও বন্টন পদ্ধতি

ক. যাকাত উসূল ও বন্টন করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। রসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীন রাষ্ট্রীয়ভাবেই এ দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামী সরকারের একটি যাকাত বিভাগ থাকবে। এ বিভাগের দায়িত্ব হবে যাকাত দানকারীদের সম্পদের হিসাব করা, যাকাত ধার্য করা, উসূল করা, বন্টন করা এবং হিসাব সংরক্ষণ করা। এ বিভাগটি অর্থ মন্ত্রণালয় বা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথেও সংযুক্ত থাকতে পারে।

খ. ইসলামী সরকারের অবর্তমানে বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান যাকাত উসূল ও বন্টনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। ইসলামী সরকারের অবর্তমানে যাকাতদাতাদের জন্যে উত্তম নিজের যাকাত নিজে সরাসরি না দিয়ে এসব সংগঠন ও সংস্থার মাধ্যমে প্রদান করা।

গ. সরকার ও সংস্থার অভাবে নিজের যাকাত নিজেও দেয়া যায়। তবে তা প্রদর্শনীমূলক হওয়া ঠিক নয়। নিষ্ঠার সাথে যথাযথ খাতে বন্টন করা উচিত।

ঘ. যাকাতের তহবিল দিয়ে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণ করা উত্তম। এ কর্মসূচী ইসলামী সরকার বা ইসলামী সংস্থাগুলো গ্রহণ করতে পারে।

২০. শেষ কথা

এযাবত আমরা যে নীতিদীর্ঘ আলোচনা করলাম, তাতে যাকাতের শরয়ী গুরুত্ব সুস্পষ্ট। তবে যাকাতের বিধান প্রসংগে যে আলোচনা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে মনে অনেক প্রশ্নই উদয় হবার সুযোগ আছে। এমনকি এ বিষয়ে বিরাট গ্রন্থ রচনা করলেও বিধানগত সব প্রশ্ন নিরসন করা সম্ভব নয়। আমরা ভূমিকাতেই ইংগিত করে এসেছি, যাকাতের উপর ব্যাপক আলোচনা গবেষণা হওয়া দরকার। ইসলামী বিশেষজ্ঞদের এগিয়ে আসা দরকার। যাকাত বিষয়ে যাবতীয় অমীমাংসিত প্রশ্নের বলিষ্ঠ নির্দেশনা দেয়া দরকার। যুগের আলোকে শরয়ী মূলনীতির ভিত্তিতেত ব্যাপক গবেষণা ইজতেহাদ করা দরকার। এর উপর আলোচনা সমালোচনা ও সভা সেমিনার ব্যাপকভাবে করা দরকার। আমরা আশা করবো এক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্যে অন্যান্য ব্যক্তিত্ব, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে আসবেন।

২১. পরিশিষ্ট

চার্ট ঃ ১
যাকাত ফরয হবার শর্তাবলী
১
মুসলিম হওয়া
২
স্বাধীন হওয়া
৩
বালেগ হওয়া
?
৪
আকেল হওয়া (পাগল না হওয়া)
?
৫
নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা
৬
পূর্ণাংগ মালিক হওয়া
৭
এক বছর কব্জায় থাকা
চার্ট ঃ ২
সে মালের শর্তাবলী যাতে যাকাত ফরয হয়
১
পূর্ণাংগ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া
২
আবর্তনশীল হওয়া
৩
নিসাব পরিমাণ হওয়া
৪
প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া
৫
ঋণমুক্ত হওয়া
৬
এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া
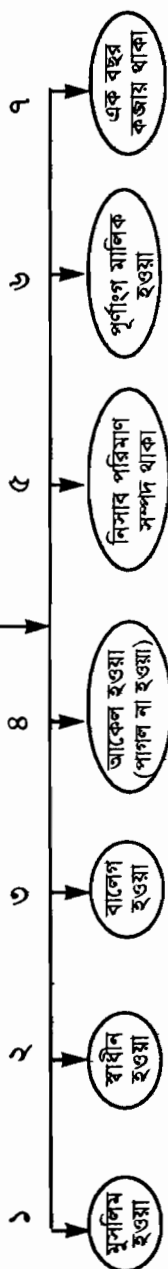
চার্ট ঃ ৩
যেসব মালের যাকাত দিতে হবে
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
নগদ অর্থ
পশু সম্পদ
সোনা রূপা
ব্যবসায় পণ্য
ফল ফসল
খনিজ সম্পদ
মধু
গুপ্ত ধন
চার্ট ঃ ৪
যেসব সম্পদে বছরপূর্ণ হবার শর্ত নেই
ফল ফসল
খনিজ সম্পদ (সোনারূপা ছাড়া)
গুপ্তধন
বাণিজ্যিক খামারের মাছ
মধু

চার্ট ঃ ৫
যেসব সম্পদের যাকাত নেই
১
নিসাবের কম
২
শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি; দালান কোঠা, দোকান ঘর ইত্যাদি স্থিতিশীল সামগ্রী
৩
বসবাসের ঘর
৪
গৃহস্থালীর ব্যবহার্য আসবাবপত্র
৫
ব্যবহারের যানবাহন
৬
ব্যবহারের ঘোড়া, হাতী, গাধা, খচ্চর
৭
ব্যবহারের পোষাক পরিচ্ছেদ
৮
ডিম উৎপাদনের হাঁস মুরগী
৯
বাণিজ্যিক দুধ উৎপাদন, কৃষি ও সেচ কাজ এবং বোঝা বহনের গরু মহিষ
১০
ব্যবহারের শিক্ষা উপকরণ
১১
মনি মুক্তা

চার্ট ঃ ৬
যাকাত কারা পাবে
১ ফকীর
২ মিসকীন
৩ যাকাত বিভাগের কর্মী
৪ মুয়াল্লিফা তুল কুলূব
৫ দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে
৬ ঋণ মুক্ত করার জন্যে
৭ আল্লাহর পথে
৮ পথিকদের জন্যে
চার্ট ঃ ৭
যাকাত কারা পাবেনা
১ নিসাবের অধিকারী
২ স্বামী
৩ স্ত্রী
৪ উপার্জন ক্ষম
৫ বাবা মা এবং উর্ধ্বগামী
৬ সন্তান এবং নিম্নগামী
৭ বনি হাশেম
৮ অমুসলিম
৯ যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব আছে

^ Goto List

সাওম

১. সাওমের অর্থ

রোযাকে আরবী ভাষায় এক বচনে 'সাওম' বহুবচনে 'সিয়াম' বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ, কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা বা কোনো কিছুকে পরিত্যাগ করা। সাওম আমাদের দেশে রোযা হিসেবে পরিচিত।

শরীয়তের পরিভাষায় সাওম অর্থ- সুবেহ সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনক্রিয়াসহ (আল্লাহ ও তার রসূল (সাঃ) কর্তৃক) নিষিদ্ধ যাবতীয় কাজ থেকে বিরত থাকা।

২. সাওমের গুরুত্ব

সাওম মুমিনদের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত ফরয। আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য রমযান মাসের সাওম লিখে দিয়েছেন। যে কোনো মুমিন রমযান মাস পাবে তাকে অবশ্যি সাওম রাখতে হবে। সকল নবীর উম্মতের জন্যই আল্লাহ সওম ফরয করেছিলেন। মুমিনদের জন্য সওম ফরয করে দিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ

"হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের উপর 'সিয়াম' ফরয করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের উপর। আশা করা যায় এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হবে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৩)

"কাজেই তোমাদের যে ব্যক্তিই এই (রমযান) মাসটির সাক্ষাত পাবে, তার জন্য সম্পূর্ণ মাস রোযা রাখা অপরিহার্য।" (সূরা বাকরা ঃ ১৮৫)

এ-তো গেলো কুরআনের কথা। আর কুরআনের বাহক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাওমকে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ বলে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ইসলামের ভিত পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলো হলো ঃ ১. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল- এই সাক্ষ্য দেয়া, ২. সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত প্রদান করা ৪. রমযান মাসের রোযা রাখা এবং ৫. বাইতুল্লায় হজ্ব করা। (বুখারী, মুসলিম)

এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো, রমযান মাসে সিয়াম পালন করা মুমিনদের জন্য-

১. অপরিহার্য ফরয, লিখিত বিধান।

২. সম্পূর্ণ রমযান মাসের প্রতিদিন রোযা রাখতে হবে।

৩. সাওম ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম।

৪. রমযান মাসের সাওম অস্বীকার করা কুফরী।

৫. সিয়াম সাধনা সকল নবীর অনুসারীদের জন্যই ফরয ছিলো।

৩. আল-কুরআনে সাওম

রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসার পর ২য় হিজরী সনে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য রমযান মাসের সাওম ফরয করে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

"হে ঈমানদাররা! তোমাদের উপর সিয়ামের বিধান লিখে দেয়া হলো, যেমন তা লিখে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের উপর। আশা করা যায়, এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হবে। নির্দিষ্ট কিছুদিন এ সিয়াম পালন করতে হবে। তবে এ সময় তোমাদের কেউ যদি রোগগ্রস্ত হয়, অথবা সফররত থাকে, তবে সে অন্য সময় সিয়ামের এই সংখ্যা পূর্ণ করবে। আর সামর্থ থাকা সত্বেও যারা রোযা না রাখে, তারা যেনো ফিদিয়া দেয়। একটি সাওমের ফিদিয়া একজন মিসকীনকে খাওয়ানো। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কিছু বেশী সৎকাজ করে, তা তার জন্য ভালো। তবে তোমরা যদি সঠিক বিষয় অনুধাবন করে থাকো, তাহলে তোমাদের জন্য রোযা রাখাই শ্রেয়।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৩-১৮৪)

দ্বিতীয় হিজরীতে এ দুটি আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু এসময় সাওম অপরিহার্যভাবে ফরয করা হয়নি। অতপর তৃতীয় হিজরীতে পুরো রমযান মাস

রোযা রাখা ফরয করে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয় ঃ

"রমযান মাস, এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন। এগ্রন্থ মানব জাতির জন্য পূর্ণ হিদায়াত এবং অকাট্য-সুস্পষ্ট শিক্ষা, যা সত্য সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য করে দেয়। কাজেই, এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাসের সাক্ষাত পাবে তার জন্য এই সম্পূর্ণ মাসটিতে রোযা রাখা অপরিহার্য। তবে যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়, কিংবা সফরে থাকে, সে যেনো অন্য সময় রোযা পূর্ণ করে। আল্লাহ তোমাদের জন্য তার বিধানকে সহজ করতে চান, কঠোর করতে চাননা। তোমাদের এ বিধান দেয়া হলো যাতে করে তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো, আল্লাহর দেয়া হিদায়াতের জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে পারো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। আর হে নবী! আমার দাসেরা যদি আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তবে তাদের বলো ঃ আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দিই। কাজেই তাদের উচিত আমার ডাকে সাড়া দেয়া এবং আমার প্রতি ঈমান আনা। একথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও, হয়তো তারা সরল পথের সন্ধান পাবে। রোযার সময় রাতের বেলা স্ত্রীর কাছে যাওয়া তোমাদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক আর তোমরাও তাদের পোশাক। আল্লাহ জানেন, তোমরা চুপি চুপি নিজেদের উপর নিজেরা খিয়ানত করছিলে। তবে তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদের মাফ করে দিয়েছেন। এখন তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে রাত্রিবাস করো এবং যে স্বাদ আল্লাহ তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন তা গ্রহণ করো। আর পানাহার করতে থাকো যতোক্ষণনা রাতের কালো রেখার বুক চিরে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তখন এসব কাজ ত্যাগ করে রাত পর্যন্ত নিজের রোযা পূর্ণ করো। যখন তোমরা মসজিদে ই'তেকাফে বসো, তখন স্ত্রী সহবাস করোনা। এগুলো হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, এগুলোর ধারেকাছেও যেয়োনা। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান মানুষের জন্য পরিষ্কার করে বলে দেন, আশা করা যায়, এর ফলে তারা ভুল কর্মনীতি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫-১৮৭)

৪. রোযা রমযান ও রোযাদারের মর্যাদা

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য পুরো রমযান মাস রোযা রাখা ফরয করে দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি রোযা এবং এই রমযান মাসকে বিরাট মর্যাদাও দান করেছেন। এখানে আমরা রোযা ও রমযানের ফযীলত সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস উল্লেখ করছি, যাতে করে রোযা ও রমযান মাস থেকে কল্যাণ লাভ করার ব্যাপারে আমরা প্রতিযোগিতা করতে পারি ঃ

১. রমযান মাসের আগমনে আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। (বুখারী)

২. রমযান মাস এলে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)

৩. রমযান মাস এলে রহমতের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)

৪. তোমাদের উপর মহান ও মুবারক রমযান মাস ছায়া বিস্তার করেছে। এ মাসে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম একটি রাত আছে। (বায়হাকী)

৫. যে ব্যক্তি রমযান মাসে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটি নফল কাজ করলো, সে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে অন্য সময় একটি ফরয আদায় করলো। (বায়হাকী)

৬. যে ব্যক্তি রমযান মাসে একটি ফরয আদায় করলো, সে ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে অন্য সময় সত্তরটি ফরয আদায় করলো। (বায়হাকী)

৭. রমযান সবরের মাস, আর সবরের পুরস্কার হলো জান্নাত। (বায়হাকী)

৮. রমযান পারস্পরিক সহানুভূতি প্রকাশের মাস। (বায়হাকী)

৯. রমযানে মুমিনের জীবিকা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। (বায়হাকী)

১০. যে ব্যক্তি রমযান মাসে কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, তা তার গুনাহ মাফ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির কারণ হবে। (বায়হাকী)

১১. যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে ঐ রোযাদারের সমপরিমাণ পুরস্কার পাবে, তবে ঐ রোযাদারের পুরস্কারের কমতি করা হবে না। (বায়হাকী)

১২. যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে তৃপ্তি পুরিয়ে আহার করাবে, আল্লাহ তাকে আমার হাউজ (কাউছার) থেকে পান করাবেন। এরপর জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে আর তৃষার্ত হবে না। (বায়হাকী)

১৩. রমযানের প্রথম দশক রহমতের, মাঝের দশক ক্ষমার আর শেষদশক জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের। (বায়হাকী)

১৪. যে ব্যক্তি রমযান মাসে অধীনস্থদের উপর থেকে কার্যভার লাঘব করবে, আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত দেবেন। (বায়হাকী)

১৫. জান্নাতে আটটি গেইট আছে। এর মধ্যে একটির নাম রাইয়্যান। রোযাদাররা ছাড়া আর কেউ এই গেইট দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (বুখারী, মুসলিম)

১৬. যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্বেকার গুনাহ-খাতা মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

১৭. যে ব্যক্তি রমযানের রাতে নামায পড়বে ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে, তার পূর্বেকার গুনাহ-খাতা মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

১৮. যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদরে ঈমান ও আত্মসমালোচনার সাথে ইবাদত করবে, তার পূর্বেকার গুনাহ-খাতা মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম)

১৯. আল্লাহ বলেন ঃ আদম সন্তানদেরকে তাদের নেক আমলের জন্য দশ থেকে সাতশ' গুণ বিনিময় দেয়া হয়। তবে সাওমের কথা ভিন্ন। সাওম আমারই জন্য, আমি এর জন্য যতো খুশি ততো বিনিময় দেবো। কারণ, রোযাদার আমারই জন্য প্রবৃত্তির কামনা এবং পানাহার ত্যাগ করে। (বুখারী, মুসলিম)

২০. রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দের সময় ঃ একটি হলো ইফতারের সময় আর অপরটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। (বুখারী, মুসলিম)

২১, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধির চাইতেও সুগন্ধিময়। (বুখারী, মুসলিম)

২২. রোযা হচ্ছে একটি ঢাল। (বুখারী, মুসলিম)

২৩, রোযা এবং কুরআন বান্দাহর জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমি তাকে পানাহার ও প্রবৃত্তির বাসনা পূর্ণ করতে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার জন্য আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে ঃ আমি তাকে রাতের নিদ্রা থেকে বাধা দিয়েছি, সুতরাং তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করুন। (বায়হাকী)

৫. রমযানের বিরাট মর্যাদার কারণ কি?

এতোক্ষণ আমরা স্বয়ং রসূলুল্লাহর (সাঃ) বাণী থেকে রমযান মাসের বিরাট মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হলাম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, অন্য কোনো মাসে না করে

রমযান মাসে রোযা ফরয করার কারণ কি? আর সেইসাথে এই মাসকে কেনো এতো বিরাট মর্যাদাবান করা হলো?

এর জবাব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, রমযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, সে কারণে যে ব্যক্তিই এ মাসের সাক্ষাত লাভ করবে, তাকে রোযা রাখতে হবে।

তাহলে বুঝা গেলো, রমযান মাসের যতো মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও ফযীলত সবই আল-কুরআনের কারণে। কুরআনই এ মাসকে মহিমান্বিত করেছে, সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং আসল মর্যাদা কুরআনের। কুরআনের বিরাট মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই রমযান মাস মুবারক মাস হয়েছে। এ মাসের যে নির্দিষ্ট রাতটিতে কুরআন নাযিল হয়েছে, সে রাত হাজার মাসের চাইতে উত্তম হয়েছে।

তাই, রোযা ও রমযান মাস থেকে উপকৃত হতে হলে, রোযা ও রমযান মাসের যতো মহত্ব, মর্যাদা, বরকত, রহমত, মাগফিরাত, সওয়াব ও পুরস্কারের কথা হাদীসে বলা হয়েছে, সেগুলো লাভ করতে হলে আল-কুরআনের সাথে সঠিক আচরণ করার মাধ্যমেই তা লাভ করা যাবে।

৬. আল-কুরআন ও রমযান

হ্যাঁ, আল কুরআনের সাথে সঠিক আচরণ করার মাধ্যমেই কেবল রমযানের কল্যাণসমূহ লাভ করা যেতে পারে। কারণ, কুরআনের উসিলায়ই তো রমযানের এই মর্যাদা। একথা আমাদের সবাইকে ভালোভাবে হৃদয়ংগম করতে হবে যে, রমযান মাস যে মহান গ্রন্থ নাযিলের কারণে মহিমান্বিত হয়েছে, আমাদেরকেও সম্মান, মর্যাদা, কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করতে হলে সেই আল-কুরআনের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সঠিক ও যথার্থ আচরণ করতে হবে তার সাথে। কিভাবে করবো আমরা আল-কুরআনের সাথে সঠিক ও যথার্থ আচরণ! হ্যাঁ, আমরা এ কাজ গুলো করার মাধ্যমে তা করতে পারি ঃ

১. আল কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে জানা ও বিশ্বাস করা।

২. একথা বিশ্বাস করা যে, এ কিতাবে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ কিতাব সন্দেহের সম্পূর্ণ ঊর্ধে।

৩. আল-কুরআনকে পড়তে ও তিলাওয়াত করতে শিখা এবং বিশুদ্ধ ও সুকণ্ঠে নিয়মিত তিলাওয়াত করা।

৪. আল-কুরআনকে বুঝতে চেষ্টা করা, এর মর্ম উপলব্ধি করা এবং বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করা।

৫. এর উপদেশ ও শিক্ষার আলোকে নিজের জীবনকে গড়ে তোলা।

৬. এর নির্দেশিত হালালকে হালাল বলে গ্রহণ করা এবং এর নির্দেশিত হারামকে হারাম হিসেবে বর্জন করা।

৭. আল কুরআনের নির্দেশিত বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকামের আলোকে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও পরিচালনা করা।

৮. আল কুরআনকে জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা।

৯. কুরআনের বাহক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে কুরআনের বাস্তব নমুনা ও মডেল হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাঁর অনুসরণ করা।

১০. কুরআনের বিধান কার্যকর না থাকলে তা কার্যকর করার জন্য চেষ্টা, সংগ্রাম ও জিহাদ করা।

১১. কুরআনের শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করা এবং যারা জানে না তাদেরকে কুরআন শিখানো।

৭. রমযান ঃ আমাদের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হবার মাস

রমযান মাস। মুসলিম উম্মাহর সিয়াম সাধনার মাস। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠীই তাদের নির্ধারিত দিনে সিয়াম সাধনা করে। সকলের নিকট সিয়াম সাধনার একটিই মৌল উদ্দেশ্যে- আত্মার পরিশুদ্ধি।

অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যতোগুলো শরীয়ত নাযিল করেছেন, এর প্রতিটি শরীয়তেই সিয়াম সাধনা ছিলো একটি শরয়ী বিধান। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর (সাঃ) উম্মতকে আল্লাহ গোটা রমযান মাসে সিয়াম সাধনার নির্দেশ প্রদান করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত গোটা দুনিয়ার মুসলমান প্রতি বছর এ মাসে রোযা রাখে।

কুরআন মজীদে রোযার তিনটি মৌলিক উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। এক. তাকওয়া অর্জন, ২. আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ এবং তিন. আল্লাহর শোকর আদায়। হাদীসে রসূলে রোযা, রোযাদার ও রমযান মাসের বহু ফযীলত বরকত ও পূণ্যের কথা বলা হয়েছে।

বস্তুতপক্ষে সেই দ্বিতয়ি হিজরী সন থেকে আজ পর্যন্ত রমযান মাসে মুসলিম সমাজে যে পূণ্যময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে আসছে, তা একান্তভাবেই নজীরবিহীন।

পূর্বকালের কথা বাদ দিলেও আজকের আমাদের এ পাপ-পংকিলতাপূর্ণ সমাজ জীবনে যে মহাসমারোহে রমযান মাসের আগমন ঘটে, যে মহাপূণ্যময় পরিবেশ এ মাস বয়ে আনে, প্রতিটি জাগ্রত চেতনায় সে অনুভূতি মৃদুমন্দ দোলে দোলা দিয়ে যায়।

মানব সৃষ্টির সূচনাতেই আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি মানুষের অন্তরে পাপ ও পূণ্যের চেতনা অন্তর্গত করে দিয়েছেন। তাই প্রতিটি মানবই তার জীবনে কখনো পাপের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, কখনো উদ্বুদ্ধ হয় পূণ্যের চেতনায়। কারো পাপের চেতনা হয়তো তার পূণ্যের চেতনাকে পরাস্ত করে রাখে। এ দু'য়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাত মানব জীবনে অহরহ চলতে থাকে। এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে যে ব্যক্তি তার পাপের চেতনাকে দমন করতে সক্ষম হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে সে হয় সফলকাম। তেমনি এ দ্বন্দ্বে কোনো জনপদের অধিকাংশ মানব গোষ্ঠীই যদি পাপাত্মাকে পরাভূত করে পূণ্যাত্মাকে সচেতন ও জাগ্রত করে তুলতে পারে, তবে সে জাতির সাফল্য কেউই রোধ করতে পারে না।

পাপ চেতনা দমনের যে যোগ্যতা, তা আল্লাহ তায়ালার এক বিরাট নিয়ামত। ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে মুসলমান ছাড়া আর কেউই এ নিয়ামত লাভ করতে পার না। এ পাপ চেতনা দমনের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগত ও মুসলিম বান্দাহদের যেসব পন্থা শিখিয়েছেন তন্মধ্যে সাওম অন্যতম।

রমযান মাস রোযার মওসুম।

রমযানের চাঁদ উদিত হবার সাথে সাথেই পূণ্যের মওসুম শুরু হয়ে যায়। মুসলিমের পূণ্যাত্মাকে এ মাসে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে জাগ্রত করে দেন আর পাপাত্মাকে করে দেন নিস্তেজ। তাই এ মাসে নেক কাজের ঢল নামে। মানুষ ঝুঁকে পড়ে পূণ্যের প্রতি। অন্তরের অনুভূতি নিয়ে মানুষ প্রতিযোগিতা করে ধাবিত হয় আল্লাহ তায়ালার ভান্ডার থেকে ক্ষমা, অনুগ্রহ ও কল্যাণ লাভের জন্য। এ মাসের পূণ্যও তাকওয়া মানুষের চিন্তার জগতে প্রভাব বিস্তার করে, মানুষের কর্মজগতে প্রভাব বিস্তার করে এবং মানুষের বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে বাহুল্য বচন থেকে। নেক কাজে মানুষের আন্তরিকতার জোয়ার আসে। পাপকে মানুষ ঘৃণা করে এ মাসে। সারা বছরের অন্যায়-অপরাধের জন্য বিনয় ও অশ্রুসজল হয়ে মানুষ ক্ষমা প্রার্থনা করে দয়াময় রহমানুর রহীমের দরবারে। সারা বছরের নেক ও পূণ্যের ঘাটতি পূরণে প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করে যায় প্রতিটি মুসলমান। গোপনে কি প্রকাশ্যে এ অনুভূতি প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে সদা জাগ্রত থাকে। এ

মাসে তার অন্তরে যা থাকে,তাই সে বলে। যা সে বলে এ মাসে তাই সে করে।

মসজিদে মসজিদে মানুষের সমারোহ। সারাদিন রোযা রেখে মানুষ তারাবীর জামাতে আল্লাহর কালামের সম্মোহনে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে পড়তে চেষ্টা করে। শেষ রাতে নফল নামায অনেকেই পড়তে চেষ্টা করে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যখনই সুযোগ মিলে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে পড়ে। এমনি করে প্রতিটি মুসলমান এ মাসে পূণ্যের পথে ধাবিত হয়। এ ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করে।

মোট কথা, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ মাসে প্রতিদিন প্রতিটি মুসলমান তার চিন্তায়, তার কথায় ও কর্মে সত্য, সততা এবং ন্যায় ও পুণ্যের অবিরাম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকে। এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রতিটি মুসলমান স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

যে দেশের সরকার ও শাসন ব্যবস্থা খোদায়ী বিধানের প্রতি উদাসীন এবং মানবীয় আইন প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার, যে দেশে কতিপয় সম্পদশালী লোকের সর্বগ্রাসী অনাচারে সমাজব্যবস্থা বিপর্যস্ত। নাস্তিক্যবাদী অসভ্যতা ও অপসংস্কৃতি যে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে, আমাদের দেশ এমন একটি দেশ। এমন একটি দেশের জনগণের মধ্যে খোদায়ী বিধানের আনুগত্য ও অনুবর্তনের জন্য এ প্রাণ চাঞ্চল্য! পূণ্যের এতো জোয়ার এখানে! নেক কাজের প্রতি কি আবেগ!

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, রমযান মাস অতিবাহিত হয়ে যাবার পর পূণ্যের প্রতি ধাবিত হবার এ যে প্রতিযোগিতা তাতেও ভাটা পড়ে যায়। মানুষের পাপবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উদ্ধত হয়ে ওঠে। রমযান মাসে চাপাপড়া পংকিলতা মাথা গজিয়ে ওঠে। কিন্তু কেনো?

বস্তুতপক্ষে মানুষ কোনো কাজের প্রশিক্ষণ নেয়ার পর সে কাজ যতোই মহৎ হোক না কেন, সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কাজে যদি তাকে নিয়োগ করা না হয়, যে রাষ্ট্রের সে নাগরিক, যে শাসন ব্যবস্থা তার কর্মক্ষেত্র সে রাষ্ট্র, সে শাসনব্যবস্থা যদি তার প্রশিক্ষণের প্রতিকূল হয়, তবে তার সে ট্রেনিং, সে প্রশিক্ষণ আর কোনো কাজেই লাগে না। আমাদের দেশের স্কুল শিক্ষকরা অনেকেই আট-দশ মাস শিক্ষাদানের বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে থাকেন। কিন্তু শিক্ষাদান ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা তাদের সে ট্রেনিং কাজে লাগাতে পারেন না।

তাই বলছি, রমযান মাসে আমাদের দেশের সরলপ্রাণ মুসলমানগণ সত্য, সততা, পূণ্য ও কল্যাণের যে মহৎ প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন, পরবর্তী এগারটি মাসে

তারা তা বাস্তবায়িত করতে না পারার প্রধান কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার প্রতিকূল নীতি, সমাজ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাস্তিক্যবাদী, খোদাদ্রোহী এবং অসভ্যতা ও অপসংস্কৃতির বলগাহীন অনুপ্রবেশ। বস্তুত, গাড়ীর ড্রাইভার ইঞ্জিন যেদিকে পরিচালিত করে গাড়ীর গোটা দেহ ও চাকাগুলো সেদিকেই চলতে বাধ্য হয়।

আজ আমাদের দেশের জন্য বড় দুর্যোগ মুহূর্ত। নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন সারাদেশকে গ্রাস করে ফেলেছে। দুর্নীতি-দুষ্কৃতি যেনো আইনে পরিণত হয়েছে। সততা, আন্তরিকতা বিদায় নিয়েছে। ত্যাগ, কুরবানী ও পরিশ্রম উপদেশ গ্রন্থে আশ্রয় নিয়েছে। এরচেয়ে বড় অকল্যাণ একটা দেশের জন্য আর কি হতে পারে?

আমাদের আর উদাসীণ থাকার সময় নেই। কেউ যদি আমাদের দেশের জনগণের জীবনাদর্শ দেখে ও জেনে নিতে চায়, তবে রমযান মাসে এ দেশের প্রতিটি পাড়ায়-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে দেখুক। এ মাসে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য ও অনুবর্তনের যে প্রাণচাঞ্চল্য তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়, এটা কোনো কৃত্রিম ও প্রদর্শনমূলক নয়। তাদের খোদা প্রেমের এ জোয়ার একান্তই আন্তরিক ও আদর্শিক।

সুতরাং এ দেশকে যদি একটি স্থিতিশীল আদর্শিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হয়, যদি শান্তি, শৃঙ্খলা ও উন্নতির পথে দেশকে এগিয়ে নিতে হয়, যদি মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক চেতনা জাগ্রত করতে হয় এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করতে হয়, তবে জনগণের অন্তরের সেই সুপ্ত আদর্শ রমযান মাসে যা সুতীব্র চেতনায় জাগ্রত হয়ে উঠে এদেশের সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থায় পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর অন্যথায় শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি আসতে পারে না। কারণ মানুষের ঈমান-আকীদা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত হোক, কিংবা থাকুক না কেনো, তার সাথে এ দেশের জনগণের অন্তরের সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না।

খোদাদ্রোহী ও নাস্তিক্যবাদী পরিবেশে এদেশের মানুষ যেসব অন্যায় ও অপরাধে লিপ্ত হয়, তাকেও তারা নিজেরাই ঘৃণা করে। কিন্তু তারা যে পূণ্য ও নেকীর কাজ করে তা তারা আন্তরিকতার সাথেই করে। রমযান মাস তার জীবন্ত নযীর।

দেশের এ মহাসংকট মুহূর্তে এদেশের প্রতিটি রোযাদার নাগরিককেই মাহে রমযানের কল্যাণময় পরিবেশ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। পূণ্য ও নেকীর কাজে এ প্রতিযোগিতার স্থায়ী রূপদান করতে হবে। এ মাসে আমাদের যে ন্যায়ানুভূতি, যে নেক প্রবণতা, যে সম্প্রীতি, যে ত্যাগ ও কুরবানীর প্রেরণা এবং যে আদর্শিক চেতনা সুতীব্রভাবে জাগ্রত হয়, আসুন আমরা সকলে মিলে আল্লাহর প্রতি আমাদের এই আনুগত্য ও অনুবর্তনের চেতনাকে চিরদিন জাগ্রত রাখি।

৮. ঐক্য ও পূণ্যশীলতার এই মাস

রমযান মুসলিম উম্মাহর আপন মাস। এ মাস উম্মাহকে নিয়ে আসে একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায়। বিরতিহীন রুটিনের এক শক্তিশালী প্রশিক্ষণ কোর্স। এ প্রশিক্ষণ ঐক্যের, এ প্রশিক্ষণ আনুগত্য ও আন্তরিকতার, এ প্রশিক্ষণ পূণ্যবান মানুষ তৈরীর, এ প্রশিক্ষণ একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের।

মুসলমান একে অপরের ভাই। এ ভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদ হচ্ছে ঈমান। ঈমান তাদের একজনকে অপরজনের দ্বীনী ভাইয়ে পরিণত করে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী এই ঈমান ভিত্তিক ভ্রাতৃশক্তিকে আল্লাহ তায়ালা একটি উম্মাহ বলে ঘোষণা করেছেন। আর এই উম্মাহর উপাধি তিনি নিজেই দিয়েছেন 'উৎকৃষ্ট উম্মাহ' এবং 'মধ্যপন্থী উম্মাহ'। বস্তুত মধ্যপন্থী উম্মাহ এবং উৎকৃষ্ট উম্মাহর একই অর্থ। কারণ মধ্যপন্থী উম্মাহ বলতে তো সেই উম্মাহকেই বুঝায় যারা 'আদল', 'ইনসাফ' ও 'ন্যায়-নীতির' উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ জাতি। এই উম্মাহকে উৎকৃষ্ট উম্মায় পরিণত করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা রমযান মাসে সিয়াম সাধনারূপে তাদের জন্য একটি শক্তিশালী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান করেছেন।

গোটা রমযানে সিয়াম সাধনার মধ্যদিয়ে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানগণ নজীরবিহীন ঐক্য ও আনুগত্যের নিদর্শন স্থাপন করে। বিশ্বব্যাপী সকল মুসলিম চাঁদ দেখে রোযা থাকা আরম্ভ করে আবার চাঁদ দেখে রোযা রাখার সমাপ্তি ঘটায়। এতে তারা প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ পালনে ঐক্যবদ্ধ। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সূর্যোদয় হবার পূর্বেই তারা সকলে সেহরী খাবার সমাপ্তি ঘটায়। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সূর্যাস্তের পূর্বে তারা গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে রোযা ভঙ্গের কারণ ঘটায় না। তাঁরই আনুগত্যের জন্য সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে রোযা ভঙ্গ করে। আল্লাহরই উদ্দেশ্যে আবার তারা শেষ

রাতের নিবিড় নিদ্রা ভঙ্গ করে জেগে ওঠে। রোযার এসব বিধান পালন করতে গিয়ে সারা বিশ্বের মুসলমানরা একথা প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহ তায়ালার একান্ত অনুগত। তাঁর আনুগত্য, তার নির্দেশ পালনে তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ। এই আনুগত্য বিধানে তারা নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার পূর্ণ অনুসারী।

সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের আন্তরিকতার নির্দশন স্থাপন করে। কঠোর ক্ষুৎ-পিপাসার মধ্যেও তারা রোযা রেখে পানাহার করেনা। ছাতিফাটা পিপাসায়ও কোনো রোযাদার পানি পান করে না। অথচ কোনো রোযাদার ইচ্ছা করলে আল্লাহ ছাড়া সকলের অগোচরেই পানাহার করতে পারে। ইচ্ছা করলে সে গোপনে অশ্লীল কাজে নিমজ্জিত হতে পারে। কিন্তু রোযাদার এসব করেন না। কেনো করেন না? এ জন্য করেন না যে, তিনি তার মনিবের নির্দেশ পালনে একান্ত আন্তরিক। এ থেকে একজন রোযাদার মুসলিম এ কথা প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীতে মুসলিমের আন্তরিকতার চাইতে অধিক আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

এ মাসে তাকওয়া ও পূণ্যের জোয়ার আসে। মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা জাগ্রত হয়। মানুষ অধিক অধিক মাগফিরাত কামনা করে। অধিক অধিক নেক ও কল্যাণের কাজে লিপ্ত হয়। মুমিনের অন্তরে এ মাসে ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের তীব্র অনুভূতি জাগ্রত হয়। নিজে ভালো ও ন্যায় কাজে অগ্রসর হয়। অপরকেও এ জন্য উৎসাহিত করে। নিজে মন্দ ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে, অন্যদেরকেও তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। পূণ্যের এই প্রবণতা এবং অপূণ্যের বিতাড়ন এ মাসে দারুণ ব্যাপকতা লাভ করে। এই বিস্তৃতি ব্যক্তি ও পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

এখন দেখুন, মুসলমানরা যে মাসব্যাপী এ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করে এর পেছনে কি কোনো উদ্দেশ্য নেই? একি শুধু প্রশিক্ষণের জন্যই প্রশিক্ষণ? না তা নয়। মূলত এর পেছনে রয়েছে বিরাট উদ্দেশ্য। আর সে উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের সিস্টেম চালু করা। এ কোর্স মুসলমানদেরকে এই শিক্ষাই দেয় যে, তোমাদের জীবনের প্রতিটি বিভাগকে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন করে দিতে হবে। তোমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের গোটা ব্যবস্থাপনাকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে। গোটা সমাজে নেক ও পূণ্যশীলতার জোয়ার আনতে

হবে। তোমাদের জীবনের প্রতিটি কাজের পেছনে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা কার্য়কর থাকতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর বিধানের অধীন জীবন যাপন করতে হবে। সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশ ও বিধান কার্যকর করার জন্য সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নিজেদের মধ্যে তাদেরকে এমন সুদৃঢ় ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে, যে ঐক্যের আঘাতে তাদের সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সকল অন্যায়, দুষ্কৃতি ও খোদাহীনতা বিদূরিত হয়ে যাবে এবং কল্যাণ ও পুণ্যশীলতার এক অনাবিল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাবে।

এরকম সুন্দর ও কল্যাণময় সমাজ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রশিক্ষণ কোর্স হিসেবেই বারবার ফিরে আসে মুসলমানদের জীবনে মাহে রমযানের সিয়াম সাধনা। এরকম সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ছাড়া মুসলমানদের জন্য আল্লাহর প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যশীল হয়ে থাকা সম্ভব নয়, যেমনটি আনুগত্যের শিক্ষা প্রদান করে মাহে রমযানের সিয়াম সাধনা। 'উৎকৃষ্ট উম্মাহ' হওয়াও এ ছাড়া মুসলমানদের জন্য সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে যেখানে শতকরা পঁচাশি জন মুসলমান, যেখানকার অধিকাংশ মানুষ রমযানের রোযা রাখে, বড়ই দুঃখের বিষয় এমন একটি দেশে রোযার শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত নেই। এখানে নামাযের সময়ের জন্য সরকারী নির্দেশ আছে। কিন্তু নামায পড়ার জন্য সরকারী নির্দেশ নেই। হোটেল রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখার ঘোষণা দেয়া হয়, কিন্তু রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হয় না। রাষ্ট্রপ্রধান ইসলামকে একমাত্র মুক্তিপথ বলে ঘোষণা করেন কিন্তু আল্লাহর আইন ও সার্বভৌমত্বকে কার্যকর করেন না। এখানে কালো ও সামরিক আইন বৈধ করার বিল পাস হয়, কিন্তু আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার বিল পাশ হয় না। এ জন্য আমরা আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবো?

তাই রোযার শিক্ষা আমাদের জীবনে কার্যকর করতে হবে। ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে। এজন্য সকল রোযাদারের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা।

৯. সাওম ঃ মনীষীদের দৃষ্টিতে

১. ইমাম গাযালী (রঃ) ঃ রোযার উদ্দেশ্য ও মানব জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে ইমাম গাযালী (রঃ) বলেন ঃ

"রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ খোদায়ী স্বভাবের একটি স্বভাব নিজের মধ্যে সৃষ্টি করবে। এ গুণটি হচ্ছে সামাদিয়াত বা মুখাপেক্ষাহীন হওয়া। মানুষ সাধ্যানুযায়ী ফেরেশতাদের অনুসরণে আত্মার কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হবে। কারণ ফেরেশতারা কামনা-বাসনা থেকে পবিত্র এবং মানুষের মর্যাদা তো পশুর চেয়ে অনেক উর্ধে। তাছাড়া কামনা-বাসনাকে দমন করার জন্য তাকে বুদ্ধি ও বিবেক দান করা হয়েছে। অবশ্য ফেরেশতা আর মানুষের পার্থক্য এখানে যে, মানুষের উপর কামনা-বাসনা বিজয়ী হয়ে যায় এবং এ থেকে পবিত্র হবার জন্য তাকে কঠিন মুজাহেদা করতে হয়। যখন তার কামনা-বাসনা তার উপর বিজয়ী হয়ে যায়, যখন সে 'আসফালা সাফেলীন' বা সর্ব নিকৃষ্ট স্তরে পৌঁছে যায়, তখন তার মধ্যে আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। আর যখন কামনা-বাসনার উপর সে বিজয়ী হয় তখন সে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় ভুষিত হয় এবং সে পৌঁছে যায় ফেরেশতা (স্বভাবের) জগতে।"[১]

২. আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম (র) ঃ এ কথাটাই আরো স্পষ্ট করে এভাবে বলেছেন আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম ঃ

"রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেনো তার স্বভাব ও কামনার জিঞ্জির থেকে মুক্ত হতে পারে। তার জৈবিক চাহিদা শক্তির মধ্যে যেনো ভারসাম্য সৃষ্টি হয় এবং এরই মাধ্যমে যেনো চিরন্তন কল্যাণ ও সৌভাগ্যের পথে নিজেকে পরিচালিত করতে পারে এবং এ উদ্দেশ্যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা যেনো তার কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত করে দেয়। সে যেনো বুঝতে পারে, নিঃস্ব-ভুখা লোকদের কি বেদনা। নিজের প্রতি শয়তানের আক্রমণের পথকে যেনো সে সংকীর্ণ করে দিতে পারে। তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেনো সেসব আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখতে পারে যাতে দুনিয়া ও আখিরাতের অকল্যাণ রয়েছে। এ হিসেবে রোযা মুত্তাকীদের লাগাম, মুজাহিদদের ঢাল এবং নেক্কারদের যুহদ ও পরহেযগারী।"

"রোযা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি হিফাযতে বড়ই প্রভাবশালী। মন-মগজে খারাপ চিন্তা ধূমায়িত হবার ফলে যেসব ক্ষতির আশংকা থাকে, রোযা তা থেকে মানুষকে হিফাযত করে। যা কিছু স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর রোযা সেসব দূরীভূত করে দেয়। কামনা-বাসনার পরিণতিতে মানুষের

১. ইহয়াউল উলুম ঃ ১ম খণ্ড

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেসব খাবাবীতে লিপ্ত হয়, রোযা সেগুলো দমন করে দেয়। রোযা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীর জন্য সাহায্যকারী।"[২]

৩. আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) ঃ মাহে রমযান সম্পর্কে আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর উপদেশ ঃ

"জেনে রাখো, রমযানই পবিত্রতা অর্জন ও আত্মশুদ্ধির মাস। এ মাস খোদার অনুগত বান্দাহদের মাস। সেসব লোকদের মাস, যারা আল্লাহর স্মরণে অন্তরকে সিক্ত রাখে। ঐসব লোকদের মাস, সত্য ও সবর যাদের ভূষণ। এ মাস যদি তোমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে না পারে, গুনাহ থেকে তোমাকে বিরত রাখতে না পারে, বেদআতপন্থী ও বদকারদের সংশ্রব থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে, তবে আর কোন্ জিনিস তোমাকে এসব জিনিস থেকে হিফাযত করবে? এরচেয়ে উত্তম কোনো জিনিস কি আছে, যা তোমার উপর প্রভাব ফেলতে পারবে? এমতাবস্থায় তোমার দ্বারা কোনো নেক কাজের আশা করা যায় না এবং তোমার পক্ষে কোনো বদ কাজ থেকে বিরত থাকারও সম্ভাবনা দেখা যায়না। মুক্তি ও নাজাতের কোনো উপায় তোমার নেই।"

"রমযান মাস তোমার দোস্ত! অশ্রু দিয়ে এই মাসকে বিদায় দাও। অন্তরের সমস্ত খারাবী দূরে নিক্ষেপ করো। বড় বেশী কান্নাকাটি করো। এতে সন্দেহ রয়েছে, আগামী বছর রমযান মাস তোমার ভাগ্যে জুটবে কিনা। অনেক রোযাদার এমন আছে, যারা আর একটি রমযান মাস পাবে না।"[৩]

৪. মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) ঃ মাহে রমযানের ফযীলত ও বরকত সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী শাইখ আহমদ সরহিন্দী (রঃ) বলেন ঃ

"এ মাসে সর্বপ্রকার কল্যাণ ও বরকতের সমন্বয় ঘটেছে। গোটা বছর মানুষ যতো বরকত হাসিল করে, তা এ মাসের বরকতের তুলনায় এতোটা তুচ্ছ, যতোটা তুচ্ছ মহাসমুদ্রের তুলনায় এক ফোটা পানি। এ মাসে যে পরিমাণ অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সুস্থতা লাভ করা যায়, গোটা বছরের জন্য তা যথেষ্ট। পক্ষান্তরে এ মাসের অশান্তি ও মানসিক অসুস্থতা গোটা বছরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ঐসব লোকেরাই সৌভাগ্যবান, এ মাস যাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলো। পক্ষান্তরে ঐসব লোকেরাই ব্যর্থ ও বদনসীব, এ মাস অসন্তুষ্ট হলো যাদের প্রতি এবং যারা বঞ্চিত হলো সর্বপ্রকার কল্যাণ ও বরকত থেকে।"[৪]

---

২. যাদুল মাআদ ঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫২
৩. গুনিয়াতুত তালেবীন, অধ্যায় ২২
৪. মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী, পৃ ঃ ৮

অপর একটি পত্রে হযরত শাইখ বলেন :

"এ মাসে যদি কোনো ব্যক্তি নেক আমলের তৌফিক লাভ করে, তবে গোটা বছর এ তৌফিক ও সৌভাগ্য তার সঙ্গদান করবে। আর এ মাসটি যদি তার মানসিক অধঃপতন ও আন্তরিকতাহীনভাবে কাটে, তবে গোটা বছরই এভাবে অতিবাহিত হবার আশংকা রয়েছে।"[৫]

৫. আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) : রমযান মাসের রোযা শোকরিয়া প্রকাশের উপায় সম্পর্কে মওলানা মওদূদী (রঃ) বলেন :

"রমযান মাসের রোযাকে কেবল ইবাদত ও কেবল তাকওয়া অর্জনের প্রশিক্ষণ হিসেবে ফরয করা হয়নি। বরং কুরআনরূপে মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে যে মহান নিয়ামত আল্লাহ তায়ালা এ মাসে দান করেছেন, রোযাকে সে নিয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের উপায় হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিবেকমান লোকের পক্ষে তার প্রতি কোনো নিয়ামত ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পন্থা একটাই হতে পারে। আর তা হচ্ছে, যে মহান উদ্দেশ্যে উক্ত নিয়ামত তাকে দান করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা করে যাবে। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজীদ আমাদেরকে এ জন্য দান করেছেন যেনো আমরা তাঁর সন্তোষ বিধানের পথ ও পন্থা জেনে নিয়ে সে অনুযায়ী চলি এবং গোটা দুনিয়াকেও সে পথে পরিচালিত করি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রস্তুত করার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে রোযা। তাই কুরআন নাযিল হবার পবিত্র মাসে আমাদের রোযা পালন শুধু ইবাদতই নয়, কেবল নৈতিক প্রশিক্ষণই নয়; বরং সে সঙ্গে কুরআনের মতো মহান নিয়ামতের শোকরিয়া আদায়ের সঠিক উপায়ও বটে।"[৬]

রমযানকে প্রশিক্ষণের মাস বলে অভিহিত করে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) বলেন :

"রোযা প্রতিবছর পূর্ণ একটি মাস দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা মুসলমানকে ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ ও অনুবর্তনে অভ্যস্ত করে তোলে। শেষ রাতে সেহেরী খেতে উঠতে হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পান-আহার বন্ধ করে দিতে হয়। এমন অনেক কাজ আছে সারাটা দিন যেগুলো সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে হয়। সূর্যাস্তের সুনির্দিষ্ট সময় ইফতার করতে হয়। একটু আগেও নয়,

---

৫. মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী, পৃ : ৪৫

৬. তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, টীকা ১৮৭।

পরেও নয়। ইফতারের পর পানাহারের অনুমতি আছে। কিছু সময়ের জন্য আরাম-আয়েশেরও অনুমতি আছে, কিন্তু একটু পরেই তারাবী নামাযে দৌড়াতে হয়। এভাবে প্রতিবছর পূর্ণ একটি মাস সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মুসলমানকে সৈনিকের মতো একটি মজবুত আইনের দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। এরপর বাকী এগার মাসের জন্য তাকে কর্মক্ষেত্রে মুক্ত করে দেয়া হয়। এ মাসে সে যে প্রশিক্ষণ লাভ করেছে, পরবর্তী এগার মাসে তার বাস্তব কর্মে যেনো তা প্রতিফলিত হয়।"[৭]

রোযা থেকে ফল লাভের উপায় সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"এই অনুষ্ঠান (রমযান মাসের রোযা) পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের মনে যেনো খোদার ভয় ও ভালোবাসা জাগ্রত হয়। তাদের মধ্যে যেনো এমন মানসিক শক্তি সৃষ্টি হয় যাতে বড় বড় লাভজনক কাজকেও তারা খোদার অসন্তুষ্টির ভয়ে পরিত্যাগ করতে পারে। খোদার সন্তোষ লাভের আশায় যেনো কঠিন বিপদসংকুল কাজেও ঝাপিয়ে পড়তে পারে। এ শক্তি মুসলমানদের মধ্যে তখনই পয়দা হতে পারে, যখন রোযার আসল উদ্দেশ্য তারা বুঝতে পারবে এবং গোটা রমযান মাস খোদার ভয় ও ভালোবাসায় নফসের কামনা-বাসনা থেকে মনকে ফিরিয়ে রাখবে। মন মানসিকভাবে খোদার সন্তোষ লাভের জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলমান সমাজ মাহে রমযানের পরই এ অভ্যাস ও অভ্যাসলব্ধ গুণাবলীকে এমনভাবে হারিয়ে ফেলে যেমন কেউ খাদ্য গ্রহণ করে অমনি বমি করে ফেললো। উপরন্তু মুসলমান ইফতার করার সাথে সাথেই সারাদিনের পরহেযগারী দূরে নিক্ষেপ করে ফেলে। এরূপ অবস্থায় রোযার আসল উদ্দেশ্য কোনো মতেই হাসিল হতে পারে না। রোযা কোনো যাদু নয়, কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠান পালন করলেই বড় কোনো উদ্দেশ্য লাভ করা যায় না। খাদ্য থেকে ততোক্ষণ পর্যন্ত শারীরিক শক্তি লাভ করা যায় না, যতোক্ষণ না তা পাকস্থলীতে গিয়ে হজম হবে এবং রক্তে পরিণত হয়ে শরীরের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হবে। তেমনি কোনো রোযাদার ব্যক্তিও ততোক্ষণ পর্যন্ত রোযা দ্বারা কোনো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ফল লাভ করতে পারে না, যতোক্ষণ না রোযার আসল উদ্দেশ্য সে ভালোভাবে বুঝে নেবে, তার মনমগজে তা খোদাই হয়ে যাবে এবং তার চিন্তা-কামনা ও কর্মে এ উদ্দেশ্য প্রভাবশীল হবে।"[৮]

---

৭. দারুল ইসলাম, পাঠান কোটের জুমা খুতবা ১৭ থেকে গৃহীত।

৮. দারুল ইসলাম, পাঠান কোটের জুমা খুতবা ১৮ নং থেকে।

রোযার সামাজিক উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলমানের জন্য একই মাসে রোযা ফরয করে দিয়েছেন, যেনো আলাদা আলাদা রোযা না রেখে সবাই মিলে একসঙ্গে রোযা রাখে। এর মধ্যে অসংখ্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সব ইসলামী জনপদে এ মাসটি পবিত্রতার মাস হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। সারা মুসলিম দুনিয়া তখন ঈমান, খোদাভীতি, খোদার আনুগত্য, পাক-পবিত্র আচরণ ও সৎকর্মে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এসময় সর্বপ্রকার দুষ্কর্ম দমিত হয়, সৎকর্মকে উৎসাহিত করা যায়। সৎলোকেরা সৎকর্মে পরস্পরকে সহায়তা করে থাকেন। অসৎ লোকেরা দুষ্কর্ম করতে লজ্জাবোধ করে। ধনীর মধ্যে দরিদ্রকে সাহায্য করার উৎসাহ সৃষ্টি হয়। আল্লাহর পথে বেশী বেশী সম্পদ ব্যয় করা হয়। সকল মুসলমান একই অবস্থায় ফিরে আসে এবং এ একই অবস্থায় এসে তারা অনুভব করে যে, মুসলমান সব এক জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ হচ্ছে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সমবেদনা ও অভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার কার্যকরী পন্থা।"[৯]

১০. সাওমের প্রকারভেদ

ইসলামের বিধি অনুযায়ী ইতিবাচক নেতিবাচক দু'প্রকার সাওম রয়েছে। ইতিবাচক সাওম চার প্রকার। যেমন- ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নত, ৪. নফল। নেতিবাচক সাওম দু'প্রকার। যেমন- ১. মাকরূহ ও ২. হারাম।

ক. ফরয সাওম ঃ চন্দ্র মাস অনুযায়ী রমযানের এক মাস সাওম আদায় করা ফরয।

খ. ওয়াজিব সাওম ঃ মান্নত ও কাফফারার সাওম ওয়াজিব।

গ. সুন্নত সাওম ঃ নবী করীম (সাঃ) নিজে যে সাওম পালন করেছেন এবং উম্মতকেও পালন করতে বলেছেন, তাই সুন্নাত সাওম। এর মধ্যে রয়েছে- ১. আশুরার সাওম। মুহাররাম মাসের নয় ও দশ তারিখ। ২. আরাফার দিনের সাওম, ৩. আইয়্যামে বীযের সাওম। অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সাওম।

ঘ. নফল সাওম ঃ উপরোক্ত তিন প্রকার বাদে বাকী সকল ইতিবাচক সাওমই নফল সাওম। যেমন- শাওয়াল মাসের ছয়টি ও অন্যান্য সাওম।

ঙ. মাকরূহ সাওম ঃ কেবলমাত্র শনিবার কিংবা রোববারে সাওম পালন

---

৯. রেসালায়ে দ্বীনিয়াত (ইসলাম পরিচিত)।

করা মাকরূহ। আশুরার দিন শুধু একটি সাওম মাকরূহ। স্বামীর অনুমতি ছাড়া নারীর নফল সাওম মাকরূহ।

চ. হারাম সাওম ঃ বছরে পাঁচ দিন সাওম পালন করা হারাম। ১. ঈদুল ফিতরের দিন, ২. ঈদুল আজহার দিন, ৩. আইয়্যামে তাশরীকের দিনসমূহ অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই যুলহজ্ব।

১১. সাওমের শর্ত

সাওম ফরয হবার শর্ত চারটি;

১. ইসলাম অর্থাৎ মুসলিম হওয়া।

২. বালিগ হওয়া।

৩. আকল অর্থাৎ বুঝজ্ঞান হওয়া।

৪. রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া।

১২. যারা রমযান মাসে রোযা ভাঙ্গতে পারে

১. রোগগ্রস্ত ঃ কোনো ব্যক্তি রমযান মাসে রোগগ্রস্ত হলে রোযা ভাঙ্গতে পারে। তবে পরবর্তীতে সেগুলো কাযা করতে হবে।

২. মুসাফির ঃ কেউ যদি রমযান মাসে কসর নামায পড়ার দূরত্বে সফর করে, তবে সে রোযা ভাঙ্গতে পারে। তাকেও পরবর্তীতে কাযা করতে হবে।

৩. নিফাস ও ঋতুবতী ঃ সন্তান প্রসবের পর এবং মাসিক চলাকালে মহিলারা রোযা ভাঙ্গবে। তবে পরবর্তীতে কাযা করতে হবে।

৪. গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিনী ঃ বড় ধরনের স্বাস্থ্যহানির আশংকা থাকলে তারা রোযা ভাঙ্গতে পারে এবং প্রতিটি রোযার জন্য একজন মিসকীন খাওয়াতে পারে।

৫. অক্ষম ঃ বৃদ্ধ বয়স বা এমন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি যার সুস্থ হয়ে উঠার আশা নেই, এমন ব্যক্তিরা রোযা ভেঙ্গে প্রতিটি রোযার জন্য একজন মিসকীন খাওয়াতে পারে।

১৩. সাওম সহী হবার শর্তাবলী

১. মুসলিম হওয়া।

২. নিয়্যত করা।

৩. মহিলাদের হায়েয-নিফাস থেকে মুক্ত হওয়া।

১৪. সাওম অবস্থায় নিষিদ্ধ

রোযাদারের জন্য সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকা ফরয ঃ

১. আহার করা থেকে।

২. পান করা থেকে।

৩. যৌন বাসনা পূর্ণ করা থেকে।

১৫. রোযাদারের জন্য সুন্নত ও মুস্তাহাব কাজ

১. সেহেরী খাওয়া।

২. সেহেরী শেষ সময়ে খাওয়া।

৩. সেহেরী খাবার সাথে সাথে রোযার নিয়্যত করা।

৪. সূর্যাস্তের সাথেসাথে ইফতার করা।

৫. খেজুর বা পানি দিয়ে ইফতার আরম্ভ করা (মুস্তাহাব)।

৬. গীবত, পরনিন্দা, মিথ্যা বলা, ঝগড়া করা, গোস্বা করা, অশ্লীল কথা বলা ইত্যাদি নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা। সাওম ছাড়া অন্য সময়েও এগুলো থেকে বিরত থাকা সুন্নত।

ই'তেকাফ

ই'তেকাফ

১. ই'তেকাফ কি?

আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে একটা নির্দিষ্ট সময় মসজিদে পূর্ণাঙ্গ অবস্থানকে ই'তেকাফ বলে। যিনি ই'তেকাফ করেন তাকে 'মু'তাকিফ' বলে। ই'তেকাফ যে কোনো সময় করা যায়। যখনই কেউ ই'তেকাফের নিয়তে মসজিদে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান করেন, তখনই তা ই'তেকাফ বলে পরিগণিত হয়। তবে রমযান মাসের শেষ দশ দিন বা বিশ দিন ই'তেকাফ করা সুন্নত।

২. ই'তেকাফের উদ্দেশ্য

আত্মশুদ্ধি, আত্মার পবিত্রা অর্জন, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভই ই'তেকাফের মূল উদ্দেশ্য। রমযানের শেষ দশ দিনের ই'তেকাফে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম একটি মর্যাদাবান রাতের করাই সন্ধান উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ও সন্তোষ লাভের মাধ্যমে ই'তেকাফ দ্বারা অশেষ পূণ্য হাসিল হয়ে থাকে। দুনিয়ার যাবতীয় চিন্তা ও ঝামেলা মুক্ত হয়ে ই'তেকাফের মাধ্যমে মানুষ বাতিলের মোকাবিলায় আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক শক্তি ও চেতনা লাভ করে থাকে।

৩. ই'তেকাফের প্রকারভেদ

ই'তেকাফ তিন প্রকার। যেমন ১. ওয়াজিব ই'তেকাফ, ২. সুন্নত ই'তেকাফ ও ৩. মুস্তাহাব ই'তেকাফ।

ক. ওয়াজিব ই'তেকাফ

মান্নতের ই'তেকাফ ওয়াজিব। চাই তা শর্তে হোক কিংবা বিনা শর্তে। শর্তে হবার অর্থ হচ্ছে, কারো একথা বলা যে, আমার অমুক উদ্দেশ্য হাসিল হলে আমি ই'তেকাফ করবো। ওয়াজিব ই'তেকাফ কমপক্ষে এক দিন হতে হবে। ওয়াজিব ই'তেকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। হাদীসে আছে, হযরত ওমর একদিন হুজুর (সা)কে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাহেলী যুগে আমি মসজিদে হারামে এক

রাত ই'তেকাফ করার মান্নত করেছিলাম।" হুজুর (সা) বললেন, "তোমার মান্নাত পূর্ণ করো।" (বুখারী)

খ. সুন্নাত ই'তেকাফ

রমযান মাসের শেষ দশ দিনের ই'তেকাফ হচ্ছে সুন্নত। কেবলমাত্র হানাফী মাযহাবে রমযানের শেষ দশ দিনের) এ ই'তেকাফ হচ্ছে সুন্নতে মুয়াককাদা। তবে কিছু সংখ্যক লোক ই'তেকাফ করলে অন্যরা দায়িত্ব মুক্ত হবে বলে এ মযহাবের রায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ "হুজুর (সাঃ) সব সময় রমযানের শেষ দশদিন ই'তেকাফ করতেন। ইন্তেকাল পর্যন্ত এ নিয়ম তিনি পালন করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তেকাফের সিলসিলা জারি রাখেন।" (বুখারী)

হযরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) বলেন, "রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি রমযানে দশ দিন ই'তেকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন, সে বছর বিশ দিন ইতে'কাফ করেন।" (বুখারী মুসলিম)।

গ. মুস্তাহাব ই'তেকাফ

রমযানের শেষ দশ দিন ব্যতীত অন্য যে কোনো সময় ই'তেকাফ করা মুস্তহাব। মুস্তাহব ই'তেকাফের জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই। এ ই'তেকাফ সামান্য সময়ের জন্যও হতে পারে, কিংবা একদিন বা একাধিক দিনের জন্যও হতে পারে।

৪. ই'তেকাফের শর্তাবলী

১. মুসলমান হওয়া, ২. বালেগ ও আকেল হওয়া, ৩. পবিত্র থাকা, ৪. ই'তেকাফের নিয়্যত করা, ৫. পূর্ণাঙ্গ সময় (আবশ্যকীয় প্রয়োজন ব্যতীত) মসজিদে অবস্থান করা ইত্যাদি ই'তেকাফের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

৫. নারীদের ই'তেকাফ

হাদীস থেকে জানা যায়, নারীরাও ই'তেকাফ করতে পারে। নারীদের ই'তেকাফ ঘরে (নামাযের স্থানে) হওয়া বাঞ্ছনীয়। নারীদের ই'তেকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি আবশ্যক। সন্তান প্রসব করলে, গর্ভপাত হলে কিংবা ঋতুস্রাব দেখা দিলে ই'তেকাফ ছেড়ে দিতে হবে।

৬. ই'তেকাফ অবস্থায় করণীয়

ই'তেকাফ অবস্থায় আল্লাহর যিকির, তাসবীহ, তাকবীর, ইস্তেগফার, দরূদ, কুরআন তিলাওয়াত ও জ্ঞানচর্চা করা মুস্তাহাব। মসজিদে থেকে করা সম্ভব এমন সব ইবাদাতই ই'তেকাফ অবস্থায় করা যায়।

৭. ই'তেকাফে মাকরূহ বিষয়

ই'তেকাফ অবস্থায় নিরর্থক, বাজে ও বেহুদা কথা ও কাজ মাকরূহ। চুপ থাকা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় ভেবে চুপ থাকাও মাকরূহ।

৮. যেসব কারণে ই'তেকাফ বাতিল হয়ে যায়

১. মসজিদ বা ই'তেকাফের স্থান থেকে নিষ্প্রয়োজনে বের হলে, ২. ইসলাম পরিত্যাগ করলে, ৩. অজ্ঞান, পাগল বা মাতাল হলে, ৪. মাসিক দেখা দিলে. ৫. সন্তান ভূমিষ্ট হলে বা গর্ভপাত হলে, ৬. সহবাস করলে, ৭. বীর্যপাত ঘটালে, ৮. মুতাকিফকে কেউ জোরপূর্বক মসজিদে থেকে বের করে দিলেও ই'তেকাফ বাতিল হয়ে যাবে।

৯. যেসব কাজে মুতাকিফ বাইরে যেতে পারবে

১. প্রস্রাব, ২. পায়খানা, ৩. ফরয গোসল। অবশ্য পেশাব-পায়খানার প্রয়োজনে বাইরে গেলে ফিরে আসার সময় সাধারণ গোসল করে আসাও জায়েয বলে কেউ কেউ মনে করেন, ৪. যাদের খানা পৌছে দেয়ার লোক নেই, তারা খানা খেতে বাইরে যেতে পারবেন, ৫. জুম'আর নামাযের জন্য অন্য মসজিদে যাওয়া, যদি ই'তেকাফের মসজিদে জুম'আর নামায না হয়। এসব প্রয়োজন সারার পর মুতাকিফ এক মুহূর্তও বাইরে দেরী করবেন না এবং অন্য কাজে লিপ্ত হবেন না।

১০. ই'তেকাফ অবস্থায় যেসব কাজ মুবাহ

মুতাকিফের জন্য চুল আঁছড়ানো, চুল ছাঁটা বা কামানো, নখ কাটা, শারীর পরিষ্কার করা, ভালো পোশাক পরা, সুগন্ধি লাগানো মুবাহ। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছে করলে এসব কাজ করতে পারেন। আবার নাও করতে পারেন।

১১. ই'তেকাফের গুরুত্ব

আত্মার পরিশুদ্ধি ও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য ই'তেকাফ একটি উত্তম মাধ্যম। দুনিয়ায় মানুষকে হাজারো ব্যস্ততা ও ঝামেলার মধ্য দিয়ে জীবন

যাপন করতে হয়। শয়তান মানুষের পিছে অবিরাম লেগে আছে। প্রতিটি কাজে সে মানুষকে ধোকা দেবার চেষ্টা করে। সে মানুষের পাপাত্মাকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগ্রত করে তোলে। তাই দুনিয়ার প্রতিটি কাজেই মানুষকে অবিরাম পরীক্ষা দিয়ে যেতে হয়। এ পরীক্ষায় কখনো কখনো মানুষের পদস্খলন হয়ে যায়। স্ত্রী-সন্তানাদির মায়া, তাদের সুখের চিন্তা, দারিদ্র্যের অনুভূতি, লোভ, মোহ, আকর্ষণ মানুষকে প্রতিনিয়ত গুনাহের দিকে টানতে চায়। অথচ পবিত্র পরিশুদ্ধ ও পরহেযগারীর জীবনই আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয়। কেবল পবিত্র আত্মার লোকেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে, কেবল আল্লাহর ধ্যান ও তাঁর চিন্তাই মানুষকে আল্লাহর নিকটে পৌছে দেয়। যে ব্যক্তি যতোবেশী পরিচ্ছন্ন ও গভীরভাবে আল্লাহকে উপলব্ধি করতে পারে, সে ততোবেশী আল্লাহর নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। বস্তুত ই'তেকাফ মানুষের জীবনে একটি সুযোগ এনে দেয়, সংসার ও সামাজিক যাবতীয় কাজকর্ম ও লেনদেন থেকে কিছু সময় কিছু দিনের জন্য মুক্ত হয়ে মানুষ একান্তভাবে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাকার সুযোগ পায় ই'তেকাফের মাধ্যমে। এখানে স্ত্রীর চিন্তা নেই, স্বামীর চিন্তা নেই, সন্তানাদির চিন্তা নেই, সম্পদের চিন্তা নেই। মোট কথা, সকল চিন্তার উর্ধে উঠে মানুষ এখানে একমাত্র আল্লাহর চিন্তায় মশগুল হবার সুযোগ পায়। সে প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহকে ধ্যান করে, তাঁকে গভীরভাবে অনুভব করে। তাঁর আযাবের কথা মনে করে ভীত কম্পিত হয়ে ওঠে। তাঁর পুরস্কারের কথা স্মরণ করে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তাঁরই পথে চলার জন্য তাঁরই জন্য নিজেকে কুরবানী করার জন্য সে মন-মানসিকভাবে সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌছাতে সক্ষম হয়। ই'তেকাফ মানুষের উপর এমন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব সৃষ্টি করে, যা তাকে দীর্ঘদিন আল্লাহর পথে পরহেযগারীর পথে পরিচালিত করে। তাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাথে সাথে ই'তেকাফের মাধ্যমে মানুষ অনেক পূণ্য ও নেকী অর্জন করে। ই'তেকাফ মুমিন জীবনের পাথেয়।

১২. ই'তেকাফ ও লাইলাতুল কদর

লাইলাতুল কদর বা শবে কদরকে পাওয়ার জন্যই রমযানের শেষ দশ দিন ই'তেকাফ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানের শেষ দশ দিন ই'তেকাফ করতেন। কদর রাত হলো কুরআন অবতীর্ণের রাত। এ রাতকে আল্লাহ তায়ালা কদর (মর্যাদাবান) ও মুবারক রাত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি কালামে পাকে এরশাদ করেছেন ঃ

"এ কুরআনকে আমরা এক মুবারক রাতে নাযিল করেছি।"

এ মুবারক রাতকে আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র 'ক্বদর রাত' বলে অভিহিত করেছেন ঃ

"এ কুরআনকে আমরা ক্বদর রাতে নাযিল করেছি।"

ক. ক্বদর রাতের অর্থ

'ক্বদর' রাতে আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআন নাযিল করেছেন। কিন্তু ক্বদর রাত অর্থ কি? কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, 'ক্বদর' শব্দের অর্থ 'তাকদীর'। অর্থাৎ এ হচ্ছে সেই রাত যে রাতে আল্লাহ তায়ালা তাকদীরের ফায়সালা জারি ও কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেন। সূরা দুখানে এ কথাটিই বলা হয়েছে ঃ

"এই রাতে যাবতীয় বিষয়ে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ও সুদৃঢ় ফায়সালা জারি করা হয় আমাদের নির্দেশক্রমে।" (সূরা দুখান ঃ ৪-৫)

এ হিসেবে এ রাতই হচ্ছে ভাগ্য রজনী। মানুষের ভাগ্য ও তাকদীরের যাবতীয় ফায়সালা এ রাতেই হয়ে থাকে। ইমাম যুহরী বলেছেন ঃ ক্বদর অর্থ মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও সম্মান সম্ভ্রম। এ হিসেবে এখানে অর্থ দাঁড়ায় এ হচ্ছে সেই রাত যে রাত অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ, মর্যাদাশীল ও সম্মানিত। সূরা ক্বদরের তিন নম্বর আয়াতে থেকে এ অর্থেরই সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

'ক্বদর রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম কল্যাণময়।"

এখানে এ রাতের মাহাত্ম্য ও কল্যাণের কথাই বলা হয়েছে। মূলত কুরআনের দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে দু'টি অর্থই সঠিক। অর্থাৎ এ হচ্ছে অতিশয় সম্মানিত ও মর্যদাবান রাত, আর এ রাতেই তাকদীরের ফয়সালা হয়ে থাকে।

খ. ক্বদর রাত কোন্‌টি?

কুরআন মজীদের এক আয়াতে বলা হয়েছে, "রমযান মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (বাকারা ঃ ১৮৫)। অন্যত্র বলা হয়েছে, "আমরা ক্বদর রাতে কুরআন নাযিল করেছি।" এ দুটি আয়াত থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, ক্বদর রাত রমযান মাসেরই একটি রাত। কিন্তু সেই রাত কোন্ তারিখের রাত? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বিশেষ হিকমতের কারণে আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট করে ক্বদর রাত তোমাদের জানিয়ে দেননি (হাকেম)। কিন্তু রাতটি যে রমযান

মাসের শেষ দশ তারিখের মধ্যেই কোনো একটি রাত, সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে রসূলে করীমের (সাঃ) বক্তব্য রয়েছে। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা গেলো ঃ

হয়রত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "লাইলাতুল ক্বদর হচ্ছে রমযানের সাতাশ কিংবা উনত্রিশতম রাত।" (আবু দাউদ তায়ালিসী)। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মুসনাদে আহমদে আর একটি রেওয়াতের উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ "শবে ক্বদর রমযানের শেষ রাত।"

যিরর ইবনে হুবাইশ উববাই ইবনে কায়াবকে ক্বদর রাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি হলফ করে বলেন ঃ "রমযানের সাতাশতম রাত।" (মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাই, ইবনে হিব্বান)।

হযরত আবুযর (রাঃ) থেকে এ রাত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "হযরত উমার (রাঃ) হযরত হুযাইফা (রাঃ) এবং আসহাবে রসূলের বহু-লোকের এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, সে রাত রমযানের সাতাশতম রাত।" (ইবনে আবু শাইবা)।

হযরত উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "লাইলাতুল ক্বদর রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় একটি রাত। ২১তম ২৩তম ২৫তম ২৭তম কিংবা ২৯তম রাত।" (মুসনাদে আহমদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুজুর (সাঃ) বলেছেন, "লাইলাতুল ক্বদর রমযানের শেষ দশ রাতে তালাশ করো" (বুখারী)। তিরমিযী এবং নাসায়ী হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এ ছাড়া হযরত মুয়াবিয়া, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুম থেকেও সাতাশ তারিখ সম্পর্কে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে।

এসবের প্রেক্ষিতে অতীতের এক বিরাট সংখ্যক বুযর্গ ওলামায়ে কেরাম রমযানের সাতাশতম রাতকে লায়লাতুল ক্বদর মনে করেছেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে লাইলাতুল ক্বদরকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়নি। এ সম্পর্কে

মওলানা মওদূদী (রঃ) বলেন, "লাইলাতুল ক্বদরকে আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করে দেয়ার উদ্দেশ্য এ হতে পারে যে, সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা চান ক্বদর রাত্রির কল্যাণ ও মাহাত্ম্য থেকে অংশ লাভের ঐকান্তিক আগ্রহে লোকেরা বেশী বেশী রাত ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করুক।" (তাফহীমুল কুরআন, সূরা ক্বদর, টীকা-১)।

গ. হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাত

আল্লাহ তায়ালা এ রাতের ফযীলত সম্পর্কে কুরআন মজীদে এরশাদ করেন, "এ (কুরআনকে) আমরা ক্বদর রাতে নাযিল করেছি। তুমি কি জানো ক্বদর রাত কি? ক্বদর রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ রাতে ফেরেশতারা ও রূহ তাদের রবের অনুমতিক্রমে সব হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়। ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত এ রাত পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তাময়।" (সূরা ক্বদর)

সূরা দুখানে এ রাতকে বরকতময় রাত বলা হয়েছে ঃ "আমরা (এ কুরআনকে) এক বরকতময় রাত্রে নাযিল করেছি। এ রাতে প্রত্যেকটি ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত সুদৃঢ় ফায়সালা জারি করা হয়।" (দুখান ঃ ৩-৪)

রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের আশা নিয়ে ক্বদর রাতে ইবাদত করবে, তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

হুজুর (সাঃ) এ রাতকে কেন্দ্র করে রমযানের শেষ দশ দিন ই'তেকাফ-এ বসে যেতেন। উম্মতকেও তিনি রমযানের শেষ দশ রাতে শবে কদর সন্ধান করতে বলে গিয়েছেন। তাই মাহাত্ম্যপূর্ণ শবে কদরের এ রাত থেকে বরকত ও কল্যাণ লাভ করার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে তৎপর হওয়া উচিত।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআন।
২. আহকামুল কুরআন ঃ জাসসাস।
৩. তাফহীমুল কুরআন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।
৪. হিদায়া।
৫. ফিকহুয যাকাত ঃ শাইখ ইউসুফ আল কারদাভী।
৬. ফিকহুন নিসা ঃ মুহাম্মদ আতাইয়া খামীস।
৭. আসান ফিকহ ঃ ইউসুফ ইসলাহী।
৮. ইসলামী অর্থনীতি ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।
৯. মুকাররারুল ফিক্‌হ ঃ সালেহ নাসের।
১০. সহীহ বুখারী।
১১. সহীহ মুসলিম।
১২. মিশকাতুল মসাবীহ।
১৩. ফী-মা ইত্তাফাকু ওয়া ফী-মা ইখতালাফু।
১৪. রাসায়েল ও মাসায়েল ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।
১৫. আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া।
১৬. ম'জামুল লুগাতুল আরাবিয়া আলমুয়াসির ঃ মিল্টন কাওয়ান।
১৭. যাদুল মা'আদ ঃ ইবনুল কাইয়্যেম।
১৮. গুনিয়াতুত তালেবীন ঃ আবদুল কাদের জিলানী।
১৯. ইসলাম পরিচিতি ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।
২০. খুতবাত ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২১. মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী।